যুক্তি . তক্কো . ঋত্বিক

সুগত সিংহ

ঋত্বিক ঘটকের জন্ম ১৯২৫ সালে, মৃত্যু ১৯৭৬-এ। তিনি মাত্র একান্ন বছর বেঁচেছিলেন। এই অল্প সময়ে তাঁর বোহেমিয়ান জীবন, প্রাণান্ত মদ্যপান এবং আপোষহীন ক্ষ মনোভাব তাঁকে একটা কাল্ট ফিগারে পরিণত করেছিল।তাঁর মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তিপূজা আরও ফেঁপেছে। ফলে তাঁকে নিয়ে লেখালেখি প্রচুর হলেও তাঁর ভাবনাচিন্তার মধ্যে যে ঘাটতি, ভ্রান্তি এবং ফাটলগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে সঠিক আলোচনা হয়নি। কেউ কেউ কখনও সখনও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, প্রশ্নও তুলেছেন, কিন্তু ঋত্বিক ঘটক নামক দুর্বোধ্য কিংবদন্তির ছটায়, ভয়ে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, ভাবালুতায় সে সব প্রশ্ন ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। শেষমেষ তাঁকে নিয়ে আড়োআড়ো দায়সারা আলোচনা, গপ্পোগাছা, রটনা যতটা ছড়িয়েছে, যে - দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে তিনি ছবি করে গেছেন তার যৌক্তিকতা নিয়ে যথার্থ তক্কোততটা হয়নি। যুক্তি... তক্কো ... ঋত্বিক সেই প্রয়াস ।এটা করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, ঋত্বিকের দর্শনটা কী ? সারাজীবনের শিল্পচর্চায় তিনি দুই কার্ল -এর ভাবনাচিন্তায় সবচেয়ে প্রবাবিত হয়েছিলেন। একটা সময়ে তিনি কার্লগুস্তাভ ইউঙ -এর মনস্তত্ত্বে মজেছিলেন। মনে রাখতে হবে, মার্ক্স ইউঙ-এ তিনি সরে আসেননি, বরং মার্ক্স এবং ইউঙকে মেলানোর চেষ্টা করেছিলেন।

ইউঙ-এর তত্ত্বের সঙ্গে মার্ক্সবাদের কোনও গণ্ডগোল নেই। মার্ক্স একটা জগৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, ইউঙ অন্য একটা জগৎ নিয়ে ।দুটোর মধ্যে কোনও ইনার - কনট্রাডিকশন নেই ।আমি বলছি কোনও ইনহেরেন্ট কনট্রাডিকশন নেই। কালেকটিব আনকনসিয়াস মানুষের আনকনসিয়াস বিহেভিয়রকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। আর এন্টায়ার ক্লাস স্ট্রাকচার কনসিয়াস বিহেভিয়রকে ডিটারমিন করে। কিন্তু আনালাইজ, যেমন ড্রিমওয়ার্ল্ড, তুমি আমিস্বপ্ন দেখি, মার্ক্সবাদ দিয়ে তাকে অহ্যানালাইজ করে কি কোনও লাভ হবে ! সেখানে ইউঙ । দিস ইস হোয়াট আইফিল। ইউঙ -এর সঙ্গে মার্ক্সের কোনও বিরোধ নেই, দুজনে দুই জগৎ নিয়ে কারবার করেছেন ।দুটো প্রচন্ডভাবে পরস্পরের পরিপূরক।

দ্বিতীয় পর্যায় ঋত্বিকের চলচিচত্রকর্ম - নাগরিক --- সমবায় ভিত্তিতে তৈরি প্রথম ও শেষ বাংলা ছবি

১৯৫০ সালে ঋত্বিক অভিনয় করেন নিমাই ঘোষের ছিন্নমূল ছবিতে এবং তথাপি নামে অন্য একটি ছবিতে সহকারী পরিচালকের কাজ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে বেদেনী ছবি করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেটি মাঝপথে থেমে যায়। এরপর ১৯২৫ সালে তিনি নিজের গল্প নিয়ে ছবি করলেন, নাগরিক। এটিই সেই অর্থে ঋত্বিকের প্রথম ছবি। নাগরিক সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দুটি। প্রথমত, এটি প্রথম ভারতীয় ছবি, যেটা কলাকুশলীরা সমবায় ভিত্তিতে তুলেছিলেন। নেতৃত্বে ছিলেন ঋত্বিক নিজে, গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত সে - যুগের উদীয়মান গায়ক ভুপতি নন্দী এবং প্রমোদ সেনগুপ্ত। দ্বিতীয়, নাগরিক সে- সময়ে মুক্তি পায়নি।

‘‘নাগরিক’ মোটামুটি কোঅপারেটিভ ভেনচার ছিল, কেউ পয়সাকড়ি নেয়নি, ল্যাবরেটরি নেয়নি, স্টুডিও নেয়নি, এমনকী

ফ্লিল্মস্টক যেটা পাওয়া যায় না, সেটাও আমি বিনে পয়সায় পেয়েছিলাম। ... কিন্তু আমরা এমন বোকা ছিলাম যে ছবির শেষ পর্যায়ে গিয়ে ব্যবসাগত ব্যাপারে একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়লাম, আর সমস্ত জিনিসটাই নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের মন ভেঙে গেল, বুক ভেঙে গেল। ওছবি কোনওদিনই রিলিজ হবার সম্ভাবনা নেই দেখে আমরা ধরেই নিলাম যে লোকে আর ওছবি দেখতে পাবে না ?'

পরে প্রিন্টটিই নাকি হারিয়ে যায়। কিন্তু ছবিটা উদ্ধার করা বা মুক্তিলাভ করানো যে সম্ভব ছিল সেটা প্রমাণ হল ঋত্বিকের মৃত্যুর বছরখানেক পর, যখন সম্পাদক রমেশ যোশী এবং বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরির ইনচার্জ ব্রহ্মা সিং তাদের ল্যাব থেকে একটি প্রিন্ট যোশী এবং বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরির ইনচার্জ সিং তাদের ল্যাব থেকে একটি প্রিন্টউদ্ধার করলেন। ততদিনে নেগেটিব হারিয়ে গেছে। পুনের ন্যাশানাল ফিল্ম আর্কইভের সহযোগিতায় ছবিটির ডুপ্লিকেট নেগেটিভ এবং নতুন প্রিন্ট তৈরি হল এবং তা নিউ এম্পায়ার সিনেমায় মুক্তি পেল। কবে ? না, ছবিটি নিমার্ণের পঁচিশ বছর পর, ১৯৭৭ সালে, যেন প্রায় রজতজয়ন্তী বর্ষের মিউজিয়াম পিস হিসেবে। পৃথিবীর ইতিহাসেএকজন শিল্পীর মুখ বন্ধ করে দেওয়ার এত বড়ো নারকীয় ফ্যাসিবাদী ঘটনা আর ঘটেনি। নাগরিক-এর পেছনের ইতিহাস আজ খুব ধোঁয়াটে আর অস্পষ্ট মনে হয়। যাঁরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি ঠিক কী হয়েছিল। কিন্তু আমাদের জানার দরকার ছিল। কারণ ছবিটি যদি মুক্তি পেত তবে সমবায় ভিত্তিতে ছবি তৈরির একটা বিরাট সম্ভাবনা এদেশে খুলে যেত। তাই স্বার্থন্বেষী মহল ভয় পেয়েছিল এবং এই উদ্যোগকে আঁতুড়ে মারতে চেয়েছিল। কলাকুশলী থেকে শু করে স্টক বিক্রেতা পর্যন্ত যারা বিনা পয়সায় ছবিটিকে সাহায্য করেছিলেন, তারা যাতে পয়সা ফেরত না পান, ছবি তৈরির এধরনের চেষ্টায় যাতে আর না যান, প্রডিউসার ডিস্ট্রিবিউটার চক্রর হাত থেকে বেরোনোর চিন্তা আর যাতে ভুলেও না করেন, সেজন্য জন্মের মতো একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। মজার কথা হল ঋত্বিকের মৃত্যুর পর পরই ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া যে - স্মরণসভার আয়োজন করেন, সেখানে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় জানান----

'যখন 'অপরাজিত' ছবির কাজ হচ্ছে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে, তখন শুনলাম একটা ছবির প্রিন্ট সেখানে রয়েছে। সে-ছবি হল ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি 'নাগরিক' তৎক্ষণাৎ সেই ছবি দেবি । খুবই অসুবিধার মধ্যে তোলা হয়েছিল ছবিটা। সেটা দেখলেই বোঝা যায় । তার বাইরের পালিশ একদমই নেই বলতে গেলে। কিন্তু তা-ও তার মধ্যে কতগুলো এমন গুণের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, যে তাতে নবীন পরিচালক সম্বন্ধেএকটা প্রচন্ডশ্রদ্ধা জাগে আমার মনে।'

অপরাজিত তৈরি হয় ১৯৫৬ সালে, মানে নাগরিক -এর চারবছর পর। ঋত্বিকের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা না জানিয়ে যথাসময়ে সত্যজিৎ যদি এই স্বীকৃতি দিতেন তাহলে হয়তো ছবিটি পঁচিশ বছর ধরে এভাবে হারিয়ে যেত না, তাহলে হয়তো সমবায় ভিত্তিতে ছবি তৈরির ইতিহাসটাও একটু অন্যরকম হত।

নাগরিক ছবির শু শহরজীবনের মন্তাজ দিয়ে। ইট, কাঠ, পাথর, গাড়ি ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ছবির নায়ক রামু বাড়িফেরে ইন্টারভিউ দিয়ে । বাড়ি ফেরার পথে গলির মোড়ে দেখে এক ভায়োলিনবাদক অপূর্ব এক স্বর্গীয় সুর বাজিয়ে ভিক্ষে করছে। রামু আকৃষ্ট হয়, আরেকবার বাজাতে বলে। কিন্তু সে পয়সা চায়। রামু দিতে পারে না। ভায়োলিনবাদক রহস্যময়ভাবে হেসে সুরটি না শুনিয়ে চলে যায়। রামু পরিবারের বড়ো ছেলে। বাবা অবসরপ্রাপ্ত স্কুলমাস্টার। তাঁর পেনসনে সংসার চলে। অবিবাহিতা বোন সীতা একের পর এক পাত্রপক্ষের সামনে লাঞ্ছিত হয়। মা ব্যতিব্যস্ত সংসার চালাতে। প্রেমিকা উমা ক্লান্ত হয়ে পড়ে অপেক্ষা করতে করতে কবে রামু চাকরি পাবে। তারাও বাঁচার তাগিদে উচাটন। উমার বোন শেফালি ভদ্রভাবে দেহ বেচতে শু করে। সবমিলিয়ে এক দমবন্ধকরা পরিস্থিতি।

এরকম একটা অবস্থায় দুটো টাকার জন্য রামুদের পেয়িং গেস্ট রাখা হয় সাগরকে। সে জীবিকায় একজন কেমিস্ট। কয়েদিনের মধ্যে সে বাড়িতে ছেলের মতোই হয়ে যায়। একটা সময়ে তার টাকায় সংসার চলে। মধ্যবিত্তসুলভ আত্মমর্য

াদার জায়দা থেকে রামু অপমানিত বোধ করতে থাকে। নানা সংকোচ সত্ত্বেও সীতা সাগরের কাছে আত্মসমর্পণ করে একটু আর্থিক নিশ্চিন্তির আশায় । রামুর বন্ধু সুশান্ত তাকে মেহনতি মানুষের বৃহত্তর সংগ্রামে টেনে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু পাতি মধ্যবিত্তের মতো রামুর লক্ষ্য একটা চাকরি। চাকরি পাওয়া ব্যপারটাকে সে রোমান্টিসাইজ করে। তাদের দেওয়াল ক্যালেন্ডারে ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে একটা সুন্দর বাড়ির ছবি ঝোলে। সে স্বপ্ন দেখে চাকরি পেলে ওইরকম একটা ব াড়িতে উঠে যাবে। আর ভায়োলিনে সেই স্বপ্নের সুর বেজে ওঠে। শেষমেষ রামুর চাকরি হয় না। সাগরও বেকার হয়ে যায়। স্বপ্নের বাড়ির বদলে তাদের সবাইকে বস্তিবাড়িতে উঠে যেতে হয়। ভায়োলিনবাদক সেদিন তাকে সুরটা শোনাতে যায়, কিন্তু তারটাই এবার ছিঁড়ে যায়। স্বর্গীয় সুর শুনতে গেলে পয়সা লাগে, স্বপ্নের বাড়িতে যেতে গেল চাকরি পেতে হয়। মধ্য বিত্তের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়, রামু পথে নামতে বাধ্য হয়, সাউন্ড-ট্রাকে স্বপ্নের সুরের বদলে বেজে ওঠে ইনটারন্য াশানালের সুর।

একটি পরিবারের মধ্যবিত্ত স্তর থেকে ক্রমশ নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত স্তরে তলিয়ে যাওয়ার গল্প নাগরিক। কিন্তুএই বিষয়টি ছবিতে ঠিক শৈল্পিকভাবে ফুটে ওযেনি। চিত্রনাট্য ও সংলাপের জড়তা, নাটকের অভিনয়, চল্লিশের এবং পঞ্চ াশের দশকে যে- ধাঁচের সেটা বাংলা ছবিতে হত তার বাইরে না বেরোতে পারা, সব মিলিয়ে এ- ছবিতে একধরণের অ াড়ষ্টতা আছে যেটা বেশ চোখে লাগে। এসব খামতি সত্ত্বেও সেই সময়ে ছবি করতে এসে বিষয়নির্বাচনে ঋত্বিক সথেষ্ট দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। যদি ছবিটি সেদিন মুক্তি পেতে তবে এই উপমহাদেশে অন্যধারারছবির পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর ন ামটাই লেখা থাকত। কিন্তু যে - সময়ে যেটা হওয়ার সেটা না হলে তার তাৎপর্য বা অভিঘাত হারিয়ে যায়। সেই সময়ে এমন ছবি হয়েছিল----এইটুকু কৌতূহল ছাড়া নাগরিক সম্পর্কে আজ আর বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না।

অযান্ত্রিক--- যৌথ শ্রমের নয়, যৌথ স্মৃতির ভাণ্ডার

এর ছ-বছর বাদে ১৯৫৮ সালে তৈরি হল অযান্ত্রিক । সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্প থেকে। ছোটোনাগপুরের একটি ছোট্ট শহরে জগদ্দল নামে একটি পুরোনো শেভ্রলে গাড়ি নিয়ে ভাড়া খাটে বিমল । জগদ্দল ছাড়া এই দুনিয়ায় বিমলের কেউ নেই। বিমল মনে করে গাড়িটির প্রাণ আছে। জগদ্দল তার বন্ধু এবং প্রেমিকা। জগদ্দলকে নিয়ে পাগলামির জন্য বিমল অ ার - সবাইকার কাছে হাসির পাত্র হয়ে ওঠে। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা একটি ছেলে এবং মেয়ে বিমলের গাড়িতে ওঠে। পরে ছেলেটি মেয়েটিকে ফেলে পালায়। পরিত্যক্ত মেয়েটির প্রতি বিমলের একটু দুর্বলতা দেখা দেয়। এতে জগদ্দলের হয়ে যায় ভীষণ অভিমান । সেদিনই এক নির্জন পাহাড়ি রাস্তায় জগদ্দলের চলা শেষ হয়ে যায়। বিমল সচকিত হয়ে ওঠে ।এ যেন প্রায় নিকটতম আত্মীয়বিয়োগ। সেই সময়ে ভেসে আসে আদিবাসী ওঁরাওদের গানের শব্দ । নাচগ ানে মেতে থাকা ওঁরাওদের সঙ্গে বিমলের এখানে একটা প্রতিতুলনা আছে। এরপর শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিমল জগদ্দলকে আর চালু করতে পারে না। জগদ্দলের মৃত্যুটা তাকে মেনে নিতে হয় যার প্রাণ আছে সে একদিন মরবেই। পুরোনো লে াহার দরে জগদ্দলের বিভিন্ন পার্টস বিক্রি হয়ে যায়। শুধু একটি শিশু জগদ্দলের হর্নটি নিয়ে খেলার ছলে বাজাতে থ াকে। বিমল বুঝল একটা প্রকৃতির মরন বটে, কিন্তু ওই শিশুটির মধ্যে রেয়ে গেল তার প্রতিধবনি।

আমার যে প্রটাগনিস্ট বিমল, তাকে পাগল বলতে পারেন, শিশু বলতে পারেন, আদিবাসী বলতে পারেন। কারণ, এক জ ায়গাতে এই তিনই এক। সেটা হচ্ছে জড় বস্তুতে প্রাণ প্রয়োগ করার প্রবণতা । এবং এটিএকটি আর্কিটাইপাল রিঅ্য াকশন, আদিম প্রতিক্রিয়া, শিশুর যে কোনও অসাড় বস্তু দেখে কল্পনা করা, পাগলের মেঘ দেখে খেপে ওঠা এবং অনাহত আদিবাসীর প্রথম রেলগাড়ি দেখে তাকে দেবতা কল্পনা করা, একেবারে একই প্রক্রিয়া।

যে - নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান আমি অযান্ত্রিক -এ দেখিয়েছি তাতে কোহা, বেঞ্জা, খাতুরা, চালি বেচনা, ঝুমের, লুঝরি ইত্যা দি বহু নৃত্যের সমাবেশে মহাযাত্রা দৃশ্য সন্নিবিষ্ট ছিল। এতে করে প্রকাশ পাচ্ছিল জন্ম, শিকারে যাওয়া, বিবাহ, মৃত্যু,

পূর্বপুষদের প্রতি পূজা এবং নবজন্ম এই সমস্ত সাইকেলটা।

'অযান্ত্রিক' -এর মেইন থিম, মৌল উপজীব্য ছিল একটাই, যাকে আমরা 'ফিল অফ লাইফ', জীবনের নিয়ম বলতে পারি। পাগলের নতুন গামলা পেয়ে পুরোনোটি ভুলে যাওয়ার সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য এবং সর্বশেষে এক শিশুর হাতে জগদ্দলের ত্রেংকারধবনি, যাতে বিমলকে উপলব্ধির হাসিতে ভুলিয়ে দিয়েছিল, এগুলোতে সেই কথাই প্রকাশ পেয়েছে।'

'এই গল্পের যে-ব্যাপারটা আমায় সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল, তা এর দার্শনিক ভাবধারা। আমাদেরসাহিত্যে একট া নতুন ধরনের সম্পর্কের উপস্থাপনা করেছিল এই গল্প। সেই অবশ্যম্ভাবী, প্রয়োজনীয় সম্পর্ক --- মানুষ এবং যন্ত্রের।

আমাদের সাহিত্য, এককথায় আমাদের সমগ্র শিল্পসংস্কৃতি (যা কিনা মধ্যবিত্ত শহরবাসীদের সংস্কৃতি) নতুন যুগকে কখনও বেশি আমল দেয়নি। যন্ত্র অথবা ইস্পাতের চিন্তাটাই আমাদের কাছে একটা দানবীয় ব্যাপারের প্রতিবেদন করে। সৎ, চিন্তাশীল প্রত্যেকটা ব্যাপার গ্রাস করে নেয়। এই ধরনের চিন্তা সম্পূর্ণভাবে পুরাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের একেবারে বিপরীত। আঘাত আর উচ্চ চিৎকার, দ্রুত ধবংসাত্মক পরিবর্তন আর ধোঁয়ানো অতৃপ্তির ওপর এই গল্পের সমস্ত ব্যাপ ারটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমি সমাজবিদ নই। এই ঘটনাবলি ব্যখ্যা করতে পারব না। তবে এরকম হতে পারে যে, সব রকমের পরিবর্তন, বিশেষত যন্ত্রযুগ, ঘৃণ্য বিদেশি শোষকদের কীর্তি। আরও অর্থবহ কারণ থাকতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্ত যন্ত্রণার ছাপ হয়তো এতে রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই ধারণাটা শেষ পর্যন্ত এমন একটা আদর্শগত স্তরে এসে পড়ছে যে ত াতে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশেষরকম ক্ষতিসাধন করে চলেছে।

কারণ আজকের অথবা ভবিষত্যের ভারতবর্ষে অন্যান্য বাস্তব সত্যের সঙ্গে সমতা রেখে চলা এই চিন্তাধারার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা আমাদের নবলব্ধ জ্ঞান দিয়ে, একনও আমাদের ভবিষ্যৎ এবং অতীত চিন্তাধারার সমন্বয় করে উঠতে পা রিনি। তা করতে হলে আজকের দিনে যা প্রয়োজন তা হল এই যন্ত্রযুগের আবেগমুখর সমন্বয়। ভারতবর্ষে যন্ত্রের আবির্ভ াব ইংরেজদের হাত ধরে এবং এর সঙ্গে আমাদের অনেক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে। তাই আধুনিক সাহিত্য এবং শহুরে মধ্যবিত্ত মননে যন্ত্রকে দানবীয়, অমানবিক কিছু ধরে নেওয়া হয়। নচেৎ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী জড়বস্তুতে প্রাণ আরোপ করার যে অর্কিটাইপাল প্রবনতা আমাদের মধ্যে রয়েছে সে জায়গা থেকে যন্ত্রকে খুব সহজেই নিজের করে নেওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ভারবর্ষের মতো তৃতীয়বিশ্বের এই মনোভাব উন্নয়ন এবং শিল্পায়নের পক্ষে সহ ায়ক। এই ধারণার মধ্যে ভালোরকম কয়েকটি প্রমাদ আছে।

বিদেশি বা স্বদেশি পুঁজি, যার হাত ধরেই শিল্পায়ন হোক না কেন, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা গে ালমাল থাকে। আরও আরও বেশি উৎপাদনের জন্য এই ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে শ্রমবিভাজন করে চলে এবং পদ্ধতিকে নানা স্তরে বিভক্ত করে ফেলে। গাড়ির কথা হচ্ছে যখন, তখন একটি আধুনিক মোটরগাড়ির কারখানার কথাই ধরা যেতে প ারে। সেখানে নানা ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন এবং বিশেষ একটি কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। কেউ পঁচিশ তিরিশ বছরের চ াকরিজীবনে হয়তো নাটবল্টু বানিয়ে চলেন বা একই ধরণের ফিটিংস তৈরি করে চলেন। এইভাবে নিজের কাজটা তাঁর ক াছে অর্থহীন একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হয়, কোনও আনন্দ থাকে না। তারপর বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকদের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্র াংশ যখন সমন্বিত করা হয়, যখন ফাইনাল প্রডাক্ট মানে গাড়িটি তৈরি হয়, তখন প্রথমত যে - শ্রমিক শুধুমাত্র তার নাটবল্টু বা টায়ারের একটা ক্ষুদ্রাংশ বানিয়ে চলেছেন, তাঁর পক্ষে সেই জটিল অতিকায় মোটরগাড়িটি একটি অচেনা বস্তু মনে হয়, দ্বিতীয়ত তাঁর নিজের শ্রমে তৈরি বস্তুটির অধিকার থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হন, সেটা হয়ে যায় মালিকের। এই ঘটনাটি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটে । যে- ব্যাঙ্ককর্মী সারাজীবন কাউন্টারে বসে নোট গোনেন, যে-স্কুলমাস্টার সারাজীবন লস

াণ্ড, গসাণ্ড শিখিয়ে চলেন, বিমলের মতোযেসব অসংখ্য গাড়ির চালক প্রতিদিন একই পথে ট্রিপ মারেন, তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না জাতীয় সম্পদ নির্মাণে তাঁদের নিজের সৃষ্টি তাঁর চোখের সামনে অন্যের হয়ে যায় এবং অচেনা, দ ানবীয় এবং যান্ত্রিক মনে হতে থাকে। চ্যাপলিনের মর্ডান টাইমস -এ এই অমানবিক প্রক্রিয়াটার বিদ্ধে একটি প্রতিবাদ ছিল। ঋত্বিক যতই দাবি কন না কেন, ওঁরাওদের মতো আদিবাসীরা এই মানসিকতা থেকে মুক্ত, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে ভ ারতবর্ষের যে-সমস্ত আদিবাসী অঞ্চলে আধুনিক শিল্পয়ন হয়েছে তাঁরা কেউ-ই এই বিচ্ছিন্নতার বোধ থেকে মুক্ত হতে প ারেননি, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের তীব্র অ্যাকালচারেশনের সমস্যায়। নিম্নবিত্ত স্তর থেকে, মধ্যবিত্ত স্তর থেকে বা আ দিবাসী স্তর থেকে যিনি-ই শ্রম বিক্রি করতে আসবেন তাঁকেই এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অবচেতন মনের মধ্যে জারিত কোনও আর্কিটাইপাল জাদু দিয়ে এই বিচ্ছিন্নতা কাটানো সম্ভব নয়, এর থেকে উত্তরণের কেমাত্র উপায় সঠিক শ্রেণিচেতনা --- যা দিয়ে মানুষ অনুভব করতে পারে, যন্ত্র বলুন যন্ত্র, পুঁজি বলুন পুঁজি বা মানুষের যা-কিছু পার্থিব সম্পদ তা আসলে যুগ যুগ ধরে বহু মানুষের, বহু বিজ্ঞানীর, বহু উদ্ভাবকের মানসিক এবং কায়িক শ্রমের যৌথ ফসল, এ আসলে আমারই তৈরি করা ইমারত, টাটা বিড়লার নয়। একমাত্র এই অনুভব থেকেই সে নিজের সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে, নিজের বাঁচার অর্থ খুঁজে পেতে পার। হতে পারে বিমলের মতো দু-একজন ব্যতিক্রম, যারা মধ্যে প্রাণ কল্পনা করেন, সেট াও একটা ছবির বিষয় হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হয় তখনই, যখন ব্যক্তি ঋত্বিক নিজেও জগদ্দলকে যৌথ শ্রমের ভাণ্ডার হিসাবে না -দেখে যৌথ স্মৃতির ভাণ্ডার হিসেবে দেখেন এবং নিজের মায়ের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেন। প্রচুর পরিশ্রমের পর অযান্ত্রিক ছবি শেষ হয়ে যখন কলকাতায় রিলিজ হল তখন ঋত্বিক মাঝেমধ্যে হলে যেতেন। সে সময়ে একদিন হল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ তাঁর অদ্ভুত একটা অনুভুতি হয়।

'সেই গ্রীষ্মের রাত্রে দীর্ঘ কয়েকমাইল হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় আবার জগদ্দলের কথা মনে হল, মৃতা মারকথা সে আম াকে মনে করিয়ে দিল। দুজনের মিল যে কোথায় আমার সারাজীবনেও তা বোঝাতে পারব না।'

জড়বস্তুতে প্রাণ কল্পনা করার প্রবণতা, মাদার ইমেজ---সবই অবচেতন মন থেকে উঠে আসে । মিলটা সেখানেই। জগদ্দলের মৃত্যুর পর বিমলকেও আস্তে আস্তে ভুলতে হবে তার স্মৃতি, যেমন আমরাও ভুলে যাই নিকটতম আত্মীয়বিয়ে াগের কথা এটাই বাস্তবতা।

'আমি আমার মাকে ভুলে গেছি। আজকাল আর তাঁকে মনে পড়ে না। একসময়ে আমি মার কথা সারাক্ষণ ভাবতাম। ভেবে কষ্ট পেতাম। সেসব দিন কবে চলে গেছে।'

আমরা যে অনেক তীব্র এবং তীক্ষ্ণ ঘটনাও ভুলে যাই সেটা এক অর্থে শাপে বর হয়। কারণ, জীবনের সমস্ত ঘটনা, তথ্য, অনুভুতি কেউ যদি জ্বলজ্বলে মনে রাখতে চায় তো হয় সে পাগল হবে, নয় মরে যাবে। বিস্মরণশীলতা আমাদের একটি আত্মরক্ষামূলক কবচ, একটা ডিফেন্স মেকানিজম। এটা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, অবচেতন মন অবধি যেতে হয় না। তেমনই স্বাভাবিক হচ্ছে একজন শ্রমজীবী মানুষের যন্ত্রের প্রতি মমত্ববোধ ঋত্বিক যদি সরাসরি এই সত্যটি তুলে ধরতে চ াইতেন, তা হলে ছবিটি আরও সহজ, সরল এবং সাবলীল হত। অযান্ত্রিক -এর মধ্যে মহৎ ছবির অনেক গুণ আছে, কিন্তু ছবিটি সেইখানেই ডুবেছে যেখানে জোর করে আর্কিটাইপরে তত্ত্ব আনা হয়েছে। ওঁরাওদের সঙ্গে বিমলের প্রতিতুলনা ছবির সবচেয়ে দুর্বোধ্য এবং প্রক্ষিপ্ত অংশ। ঋত্বিক সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।
'আদিবাসী হিসেব করে ব্যবহৃত, যদিও তাদের মানে এখানে বোধগম্য হল না। এইজন্য আমায় বহু গাল খেতে হয়েছে।'
'আমার ভুল হয়েছিল, সর্বজনগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটিকে টেনে আনতে পারিনি। কিন্তু উপায়ও ছিল না, বিষয়বস্তু এবং পটভূমির জন্য। কাজেই এসোটেরিক হয়ে থাকতে হল, সাধারণগ্রাহ্য হওয়া গেলনা।'

লক্ষণীয়, অযান্ত্রিক হচ্ছে প্রথম ছবি যেখানে আর্কিটাইপের তত্ত্ব ঋত্বিক প্রয়োগ করেন। কিন্তু সেটা তাঁর ছবির সম্পদ না

হয়ে, বোঝা হয়ে দাঁড়াল। এরপর ঋত্বিক যে-কটি ছবি করেছেন, সব কটির ক্ষেত্রেই এই সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। ছবিগুলি দর্শকের থেকে দূরে সরে গেছে। ঋত্বিক এমন একটি ভাষায় ছবি করতে চাইতেন যা হবেস্বয়ংপ্রকাশ । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, নিজের ছবির অর্থ পরিস্ফুট করতে বার বার তাঁকে কলম ধরতে হয়েছে, কথা বলতে হয়েছে। এগুলো না থাকলে ঋত্বিকের ছবি আমরা আদৌ কতটা বুঝে উঠতে পারতাম সন্দেহ আছে। তিনি নিজেই ছিলেন তাঁর ছবির সবচেয়ে বড় টীকাকার। কারণ, অযান্ত্রিক -এর সময় থেকেই ইউঙ-এর তত্ব ঋত্বিক এবং তাঁর দর্শকের মধ্যে একটা ধোঁয়াটে পাঁচিল তুলে দিয়েছিল।

মেঘ ঢাকা তারা --- আর্কিটাইপ, হিন্দুধর্ম ও উদ্‌বাস্তু সমস্যা

ঋত্বিকের ভাবনাচিন্তার ক্রমবিবর্তনে কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় খুব পরিষ্কার। প্রথমত নাগরিক, যেখানে ইউঙীয় মনোদর্শনের ছাপ পড়েনি। সম্ভবত সে - সময়ে ইউঙ সম্পর্কে তিনি অবহিত হননি। দ্বিতীয়ত অযান্ত্রিক ছবিতে ইউঙ -এর আর্কিটাইপ তত্ত্বের সরাসরি প্রয়োগ ঘটল এবং তৃতীয় ধাপে মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০) যেখানে ইউঙ-এর তত্ত্বের সঙ্গে এল আরও দুটি উপাদান। প্রথমত হিন্দুধর্ম এবং দর্শন তাঁর ছবির আরেকটি তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি হয়ে উঠল। এর মধ্যে থেকেই ছবিতে ওবারটোনস থ্রো করার ব্যাপারটা আসতে আরম্ভ করে। এখানে আমি ভারতীয় মিথলজিকে ব্যবহার করা শু করি যেটা আমার জীবনের অঙ্গ । দ্বিতীয়ত এল দেশভাগজনিত উদ্‌বাস্তু সমস্যা। মেঘে ঢাকা তারা থেকে যুক্তি ও গপ্পো পর্যন্ত এই বিষয়গুলি বার বার ঘুরেফিরে এসেছে। এর মাঝের ১৯৫৯ সালে তিনি অবশ্য বাড়ি থেকে পালিয়ে নামে ছোটোদের একটি ছবি করেন। বাবার অত্যাচার এবং শাসনে একটি বাচচা ছেলে গ্রাম থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসে ও তারপর নানা অভিজ্ঞতার পর আবার মায়ের টানে গ্রামে ফিরে যায়। এটি ঋত্বিকের মুখ্য কোনও চলচিচত্রকর্ম নয়, তাই আমরাও সে-ছবির বিশদ আলোচনায় গেলাম না।

দেশভাগের পর উদ্‌বাস্তু হয়ে আসা একটি পরিবারে বাঁচার লড়াই এবং মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলার গল্প মেঘে ঢাকা তার া ।এই পরিবারের বড়ো মেয়ে নীতাকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে অন্য চরিত্রগুলি। সে আর্কিটাইপাল নারীত্বের, ত্যাগ এবং তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি । নীতা টিউশন করে সংসার চালায়। পরিবারের প্রয়োজনে কিছুটা স্বার্থপরের মতো বাবা-মা এখনও তার বিয়েটা দিয়ে উঠতে পারেননি। নীতার ঠিক উলটো চরিত্র তার ছোটোবোন গীতা। সে চপল এবং লোলুপ ধরনের। দিদির কাছ থেকে সে নতুন শাড়ি আদায় করে, সিনেমা দেখতে ভালোবাসে। নীতা যখন সংসারের জন্য টিউশনিতে ব্যস্ত তখন গীতা নীতার প্রেমিক সনৎকে সঙ্গ দেয়। সনতের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার খুবই উজ্জ্বল । নীতা স্বপ্ন দেখে সনৎ একদিন বড়ো বিজ্ঞানী হবে। কিন্তু সংসারের আর্থিক প্রয়োজনে নীতা এই মুহূর্তে সনৎকে বিয়ে করতে পারে ন া। গীতা এই সুযোগটা নেয়। সে দিদির সঙ্গে অবলীলায় চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। সনৎ -ও নীত ার আত্মত্যাগ ও প্রতীক্ষ ার সঠিক মূল্য না বুঝে, গীতার শরীরী মোহে ভোলে এবং দুজনে বিয়ে করে অন্য জায়গায় ঘর বাঁধে। যার কথা ছিল বড়ো কিছু করার সেই সনৎ চাকরি এবং বউ নিয়ে ঘর করার সংকীর্ণ মধ্যবিত্ততার নিজেকে নষ্ট করে। ছোটোবোনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রেমাস্পদের অধঃপতন নীতা মুখ বুজে মেনে নেয়।

নীতার ছোটো ভাই মন্টু ফুটবল খোলোয়াড়। সে -ও দিদির কাছে নানা আবদার করে। কিন্তু একটা চাকরি পেতেই আল াদা হয়। একা সুখে থাকবে এই নীতিতে। একমাত্র দাদা শংকরের সঙ্গেই নীতার কিছুটা আত্মিক যোগ ছিল। শংকর প াগলাটে গোছের, ধ্রুপদি সংগীতসাধনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বোনকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, কিন্তু সে বাস্তবজ্ঞান-বর্জিত । তাই তার চোখেও বোনের সংগ্রামটা ঠিক ধরা পড়ে না। গানের জগতে কেরিয়ার করতে সে মুম্বাই চলে যায়। লড়তে লড়তে আর পরিবারের মধ্যে নানারকম মধ্যবিত্ত শোষণের স্বীকার হতে হতে নীতাকে যক্ষ্মা রোগে ধরে। প্রথমে তার জ ায়গা হয় বাড়ির বাইরে এক কোণের ঘরে, তার এক পাহাড়ি স্যানাটোরিয়ামে। একমাত্র শংকর তার সঙ্গে যোগাযোগ র াখে। সে তখন প্রতিষ্ঠিত সংগীতশিল্পী। নির্জন পাহাড়ের খাদে বসে যক্ষ্মা রোগে ধুঁকতে ধঁকতে নীতা শংকরের কাছ থেকে

শোনে তাদের চাঁচাড়ির বাড়িটা পাকা হয়েছে, দোতলা হয়েছে, গীতার ছেলে হাঁটতে শিখেছে। এগুলোই সে দেখতে চেয়েছিল, এগুলোর জন্যই সে সারাজীবন প্রাণপাত করেছিল। এসব শুনে তার মধ্যে শেষবারের মতো বাঁচার আকুতি জেগে ওঠে। মৃত্যুর আগে শংকরের বুকে সেকান্নায় ভেঙে পড়ে, আর পাহাড়ের মধ্যে ঘুরতে থাকে তার বিলাপ , দাদা, আমি যে বাঁচতে চেয়েছিলাম। ইচ্ছাকৃত ভাবে সে কান্নাকে সাউন্ড- ট্র্যাকে ওয়াবল করিয়ে দেওয়া হয়।

'উমার সিমবলজিটা এখানে খুবই পরিষ্কার । নীতা আজ পর্যন্ত আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। তাকে আমি কল্পনা করেছি শত শত বছরের বাঙালি ঘরের গৌরীদান দেওয়া মেয়ের প্রতীক রূপে। তার জন্মদিন হয় জগদ্ধাত্রী পুজোতে। তার পাহাড় অর্থাৎ মহাকালের সঙ্গে মিলন হয় মৃত্যুতে । যখন বিদায়ের প্রথম ইঙ্গিত আসে যক্ষ্মার প্রথম আভাসে, তখন কারা যেন বিনিয়ে বিনিয়ে মেনকার বিজয়ার বিলাপ গাইতে থাকে। অবলুপ্তির আগে মুহূর্তের য়ে আলোকময় পারিপার্শ্বিকতার স্বপ্ন দেখে নীতা, ছোটো বেলায় পাহাড়ে চড়ে সূর্যোদয় দেখার স্মৃতির মধ্যে দিয়ে।'
'রবি ঠাকুর একটি কবিতা লিখে গেছলেন--- নাম রেখেছি কোমলগান্ধার মনে মনে...। বিষ্ণু দে মশাইকেরবীন্দ্রনাথ ব্যারাকপুরে একবার তাঁর চোখ দুটো দেখে বলেছিলেন যে, তুমি তো কোমলগান্ধার হয়ে বসেআছ। বিষ্ণু দে তার বহু বছর পরে এক কবিতার বই ছাপলেন যার নাম কোমলগান্ধার। রবীন্দ্রনাথের সেই যে একটি বর্ণনা, এক বিষাদাচ্ছন্ন ষোড়শী জানালার দিকে তাকিয়ে বসে আছে, বিষ্ণুবাবু তাকে ইকোয়েট করলেন সমগ্র বাংলাদেশের সঙ্গে। কিন্তু আমার বাংলা ভাঙা বাংলা, কাজেই আমাকে আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে হয়েছে।'

কোমলগান্ধার একটি শুদ্ধ স্বর। সুন্দরের ধ্যান। সেই ধ্যান এ-ছবিতে (১৯৬১০ ধারা পড়ে অনসূয়া চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। সে অভিনেত্রী, নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু নাট্য আন্দোলন তখন দ্বিধাবিভক্ত। মধ্যবিত্ত ইগোর লড়াইএবং রেষারেষিতে দীর্ণ। ভৃগু নাট্যপরিচালক, একটি দল চালায়। তাকে ঋত্বিকের নিজের অলটার ইগো বলা চলে। আর অনসূয়া এই বাংলার প্রতীক, রবীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে প্রভাবিত কোমল একটি স্বরের মতো, বিষন্ন কিন্তু সুন্দর। ভৃগু পূর্ববাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা এক যুবক । অনসূয়ার মা নোয়াখালিতে রায়টের সময় গাঁধিজির সঙ্গে গিয়ে মারা যান। তারা দুজনেই অতীতের ভারে ন্যুব্জ, স্মৃতিতাড়িত । ভৃগু এবং অনসূয়ার পরিচয় অদ্ভুতভাবে হয়। অনসূয়া বিরোধী দলের অভিনেত্রী হয়েও তার নাটকে একস্ট্রার অভিনয় করে দিয়ে যায়। অনসূয়ার উদ্যোগেই দুটি দল একসঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হয়।
নাটকের দলটিকে অভিনয়ের জন্য মাঝেমধ্যেই কলকাতার বাইরে যেতে হয়। কলকাতা এবং গ্রামবাংলা---এই কনট্রাস্টটিকে ঋত্বিক অন্যমাত্রায় ব্যবহার করেছেন। এরা যখন কলকাতায় থাকে তখন এদের মধ্যে চাপা টেনশন দ্বন্দ্ববেশি ধরা পড়ে। কিন্তু লালগোলায় গিয়ে পদ্মার বুকে নৌকাবিহার করতে করতে দলটির অধিকাংশ সদস্য নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে গানে মত্ত হয়ে ওঠে। পদ্মার পাড়ে ভাঙা রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে ভৃগুর মনে হয় ওপারে কোথাও তার দেশ। রেললাইন সেদিন ছিল যোগচিহ্, আজ বিয়োগচিহ্ রেললাইনটার উপর ট্র্যাকশট হতে থাকে, পেছনে বিলাপ চলতে থাকে, 'দোহাই আলি, দোহাই আলি'। স্ক্রিন অন্ধকার হয়। কিছু একটা কাটার ঘাঁচাং শব্দে দৃশ্য শেষ হয়।

'শকুন্তলা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রধান চরিত্রে অনসূয়া । শকুন্তলা চরিত্রটিকে ভৃ গু অন্য মাত্রা দেয়। শকুন্তলার পতিগৃহে গমনের সঙ্গে সেদিনের ভাঙা বাংলার তুলনা করে। যেদিন ঋষিগৃহ থেকে শকুন্তলা চলে গিয়েছিল সেদিন দুই বাল্য সহচরী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা থেকে শু করে হরিণশিশু, বনের গাছপালা----সব কেঁদে উঠেছিল। শকুন্তলার সেদিনের বেদনার সঙ্গে বিভক্ত বাংলার লাখ লাখ উদ্‌বাস্তুর মর্মবেদনার মিল আছে। ভৃগু চায় শকুন্তলা চরিত্রের বাঙালির আজকের ব্যথাটা অনসূয়া ফুটিয়ে তুলুক। ছবির টাইটেল থেকে শু করে শকুন্তলা নাটকের মঞ্চায়ন দৃশ্য পর্যন্তপূর্ববঙ্গের প্রচলিত গান বাজতে থাকে, মিলনের সুরের মতো। কিন্তু দলাদলি জনিত স্যাবোটাজের ফলে নাটকটি নষ্ট হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে অনসূয়া আর ভৃগুর সম্পর্ক অন্য মাত্রা পেতে শু করে। দাঙ্গায় মৃত মার যে - ডায়রিটা সে তার দাদাকেও

দেয়নি, সেটা সে ভৃগুকে পড়তে দেয়। কারণ, কিছুটা ভারসাম্যহীনতা সত্ত্বেও ভৃগুর মধ্যেই সে একটা আগুন দেখেছিল। কিন্তু অনসূয়ার জীবনে অন্য একটি কালো ছায়া আছে। সমর নামে একটি সুপাত্র তার জন্য বিদেশে রয়েছে। সমর বিলেতে বসে কেরিয়ার তৈরি করছে আর অনসূয়া অপেক্ষা করেই চলেছে। সমর অনসূয়াকে মিরান্দা বলে ডাকে, অনসূয়া তাকে বলে ফার্দিনান্দ। সেক্সপিয়ারের টেম্পেস্ট নাটকের দুই চরিত্র। মিরান্দা ছেলেবেলা থেকেসমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপে বড়ো হয়েছে। বাবা ছাড়া এ-পৃথিবীতে কারও সংস্পর্শে আসেনি। সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজডুবি হয়ে সে-দ্বীপে এসে হাজির হল ফার্দিনান্দ। তার ছোঁয়ায় প্রকৃতি-কন্যা মিরান্দার আসল প্রকৃতি জেগে উঠল। শু হল মনের মধ্যে অ ারেক ঝড়। তার আজন্মের দ্বীপ ছেড়ে ফার্দিনান্দের সঙ্গে মিরান্দা চলে গেল।

শকুন্তলা এবং মিরান্দার প্রতিতুলনা এছবিতে ইচ্ছাকৃত ভাবেই আনা হয়েছে। কারণ, এই আর্কিটাইপাল চরিত্রগুলি ন ারীর আদত মানসিকতা প্রকাশ করে। শেষসময় আসে। অনসূয়া কি যাবে ? লালগোলায় খণ্ডিত রেললাইনের উপর ট্র্যা কিং শটের মতো অনসূয়ার উপরও ট্র্যাক-শট করা হয়। সাউন্ড- ট্র্যাকে বাজতে থাকে একই বিলাপধবনি, দোহাই আ লি, দোহাই আলি। অনসূয়ার সময়ের সঙ্গে বিলেত যাওয়া আর দুই বাংলার ভাগ হওয়া রূপকার্থে এক হয়ে যায়। শেষমেষ সমরের সঙ্গে নয়, ভৃগুর সঙ্গেই অনসূয়ার মিলন হয় । এবং সমস্ত মধ্যবিত্তসুলভ অন্তর্দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে দলের সদস্যরা ঠিক করে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে একটি রিফিউজি ছেলের লেখা নতুন নাটক মঞ্চস্থ করবে। সাউন্ড-ট্র্যাকে আবার বেজে ওঠে সেই প্রচলিত বিয়ের গান। রূপকের উপর রূপক চাপিয়ে ঋত্বিক এই ছবিতে ভাঙা বাংলা, ভাঙা নাট্য আন্দোলন, শকুন্তলা, মিরান্দাকে একটা সুতোয় বাঁধতে চেয়েছেন। মেঘে ঢাকা তারা'র মূল ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্রগুলি এবং নীতার অন্তিম ট্র্যাজেডি যেখানে ভীষণ চেনা মনে হয়, মনে হয় আমাদের আশেপাশেই অনেক উদ্‌বাস্তু পরিবারে এমন ঘটনা দেখেছি, সেখানে কোমলগান্ধার আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ততটামেলে না। ফলে চরিত্রগুলিও তেমন নাড়া দেয় না। গণ-আন্দোলন থেকে গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়। কিন্তু ঋত্বিক গণনাট্য আন্দোলনের ভাঙনের দিকটা স ম্পর্কে যতটা আগ্রহী, গণ-আন্দোলন সম্পর্কে ততটা নয়। ফলে নানা স্তরে নানা রূপক নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন মুহূর্তে ছায়া ছবিটা এক ধরণের শুকনো তাত্ত্বিকতা, এ্যাবস্ট্রাকট রূপকময়তায় আটকে যায়। এ প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ ঝিাসের সমালোচনা তাৎপর্যপুর্ণ।

'কলকাতায় ভালো ভালো শিল্পীর অভাব কখনই ছিল না। কিন্তু গণনাট্য সংস্থায় এসেছে বলে সকলেই তো দেবতা ছিলেন না। মধ্যবিত্তসুলভ নাম -যশ -ঈর্ষা-অভিমান-ব্যক্তিস্বার্থের প্রশ্ন বারে বারে এসেছে এবং বিভিন্ন গ্রুপের অধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বটা মার্ক্সবাদ লেলিনবাদের নামে পরস্পর পরস্পরকে ল্যাং মারামারির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কলকাতা চিরকালই গণসংগঠনের একটা বিস্ফোটক ছিল। আমরা মূলত দেশের সমস্ত লোকের কথা বলি, চাষি মজুর তো থাকে গ্র ামে। তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আমাদের থাকেনা; অথচ মার্ক্স ও লেনিনের নামে যেটা হয় সেটা হেলথি কমপিটিশন না হয়ে একটা রাইভালরি হয়ে দাঁড়ায় । গণনাট্য আন্দোলনকে বুঝতে গিয়ে সেখানেই হয়েছে ঋত্বিকের মুশকিল---সে কোনও গণ -আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণনাট্যে আসেনি। এর ছাপ পাওয়া যাবে ওর 'কোমল গান্ধার' ছবিটিতে। সেখানে দাদাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সেল মিটিং এগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে ; আন্দোলনের দিকটা, যেটা মূল দিক, সেটা স্থান পেল না।'

সুবর্ণরেখা----ঈশ্বর ভালো এবং মন্দের সার্বজনীন আধার

সময়টা ১৯৪৮ সাল। কলকাতার আশেপাশে তখন বড়োলোকদের ফেলে রাখা পতিত জমি উদ্‌বাস্তু মানুষরা গায়ের জোরে দখল করছে। জমিদারদের লেঠের বাহিনীও অসময়ে হানা দিয়ে তাদের উৎখাত করছে। চারিদিকে তখন একটা চ াপা উত্তেজনা, থমথমে ভাব। এরকম একটা পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের ২৬শে জানুয়ারি জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে, সুবর্ণরেখা (১৯৬৫) ছবির শু কলকাতার এক উদ্‌বাস্তু কলোনিতে, যার নাম নবজীবন কলোনি। হরপ্রসাদ ভারতপতাকা

উত্তোলন করে, অঙ্গীকার নেওয়া হয় স্কুল স্থাপনের। হরপ্রসাদ এবং ঈশ্বর সেখানে পড়াবে. হরপ্রসাদ যখন কলোনির বাচচাদের ভারতমন্ত্র উচচারণ করাচ্ছে তখন লেঠেল বাহিনী কৌশল্যা নামে এক বাগদিবউকে তুলে নিয়ে যায়। কেউ তাকে সাহায্য করে না, কারণ তার বাড়ি ঢাকায়; এখানে সব অন্য জেলার লোক। কলোনি গড়ার মধ্যেও টিকে রয়েছে জেলায় জেলায় বিভেদ। বাঙালি জাতটা যে বড়ো ক্ল্যানিশ তা ঋত্বিক হাড়ে হাড়ে জানতেন । কৌশল্যার ছোট্ট ছেলে অভিরাম মাকে হারিয়ে হয়ে যায় অনাথ। ঈশ্বর তার দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয় তার ছোটোবোন সীতার সঙ্গে অভিরামের গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল গাঁধি হত্যা। হরপ্রসাদ, ঈশ্বর স্তম্ভিত হয়ে কাগজে সেই খবর পড়ে। সাউন্ড-ট্রাকে আর্তনাদের মতো ভেসে আসে গাঁধিজির শেষ উক্তি, হায় রাম। ঘটনাচক্রে ঈশ্বরের এক পুরোনো বন্ধু রামবিলাস তাকে একটিচাকরির অফার দেয়। ঈশ্বর সেটা লুফে নেয়। অভিরাম আর সীতাকে নিয়ে ঈশ্বর চলে যায় চলে যায় ঘাটশিলায়, রামবিলাসের রাইসমিল আর ফাউন্ড্রি সামলাতে। ক্ষিপ্ত হরপ্রসাদ তাকে, গালাগাল দেয় পলাতক বলে। কিন্তু ঈশ্বরের জীবনে ঘর-হারানোর যে-ট্রাজেডি ঘটে গেছে, সীতার জীবনে যাতে তা আর না ঘটে, ভবিষ্যৎ জীবনে তার যাতে একটা সুনিশ্চিত আশ্রয় জোটে, সেটাই তখন ঈশ্বরের লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

কলকাতার রিফিউজি কলোনির দমবন্ধ - করা আবহাওয়ার বিপরীতে সুবর্ণরেখা নদীর ধারে মনোরম পরিবেশে শু হয় তাদের নতুন জীবন। স্বপ্নের মতো এই পরিবেশও ধবংসের থাবা মুক্ত নয়। ঘাটশিলার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে পড়ে রয়েছে একটি ভাঙাচোরা এরোড্রোম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজরা তৈরি করেছিল। এখান থেকে উঠে বোমা প্লেনগুলো রাতের অন্ধকারে বম্বিং করে আসত শত্রুদেশে। ঈশ্বর ঠিক করে অভিরামকে পড়াশোনার জন্য হস্টেলে পাঠাবে। বিচ্ছেদের আগে মুহূর্তে অভিরাম আর সীতা পৃথিবীব্যাপী এক মহাযুদ্ধের সাক্ষী সেই এরোড্রোমের ধবংসাবশেষে সরল খেলায় মেতে ওঠে। শেষে ছোট্ট সীতার পা-দুটি রানওয়ের ফাটল ধরে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসে, 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়...।' হঠাৎ সে পড়ে যায় এক ভয়ংকর কালীমূর্তির সামনে। সীতা চমকে ওঠে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে জড়িয়ে ধরে ওই মিলেরই ম্যানেজারবাবুকে। তিনি সীতাকে সান্ত্বনা দেন, 'ও কিছু নয়, বহুরূপী'। এই দৃশ্যটি মূল চিত্রনাট্যে ছিল না। 'সুবর্ণরেখা'র শুটিং -এর সময়ে একটি ঘটনা ঘটে। তার ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে ইমপ্রোভাইস করে দৃশ্যটি লেখা হয় এবং শুটিং হয়।

'একদিনের ঘটনার কথা বলি, শুটিং হয়ে গেছে। সূর্বণরেখা নদীর কাছে আমরা তাঁবু পত্তন করেছি। হঠাৎ আমারছোটে মেয়ে দৌড়ে এসে বলল সে ভীষণ ভয় পেয়েছে, মাঠের পথে একা ছিল, হঠাৎ একজন বহুরূপী এসে উপস্থিত, কালী সেজে তাকে যেন ভয় দেখিয়ে তাড়া করেছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ছবির সীতার কথা। সেও হয়তো যেন এভাবেই মহাকালের সামনে পড়ে গিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠছে। আমি খোঁজ করলাম বহুরূপীর কীভাবে ব্যবহার করব, তার তখন কোনও নির্দিষ্ট ধারণা নেই, কিন্তু শুটিং করে নিলাম।'

এই দৃশ্যের পর ছবিটি সাতবছর এগিয়ে যায়। অভিরাম ভালোভাবে পাশ করে এবং ঘাটশিলায় ফিরে আসে। সীতাও তখন যৌবনে উপনীত। দুজনের মধ্যে ঈশ্বরের অজান্তে প্রেমের সঞ্চার হয়। ঈশ্বর অভিরামকে উচচশিক্ষার জন্য জার্মানিতে পাঠাতে চায়। কিন্তু অভিরামের ইচ্ছে সে কলকাতায় গিয়ে লেখক হবে। উদ্বাস্তু নিয়ে একটা উপন্যাস সে লিখেছে। নায়ক নিজেই। ঈশ্বর তাকে সাবধান করে, এসব দুঃখের কথা কেউ শুনতে চায় না। অভিরাম এবং সীতা দুজনেই বোঝে তাদের প্রেমের পরিণতি বিবাহে। ইতিমধ্যে উদ্বাস্তু নিয়ে দণ্ডকারণ্যগামী একটি ট্রেন থেকে মরণাপন্ন এক বুড়িকে ঘাটশিলা স্টেশনে নামিয়ে দেওয়া হয় । অভিরাম চিনতে পারে এ-ই তার হারিয়ে-যাওয়া মা। বুড়ি মারা যায়। কিন্তু অভিরামের অন্ত্যজ পরিচয় চাউর হয়ে যায়। অন্যদিকে রামবিলাস ঈশ্বরের কাজে খুসি হয়ে ঠিক করেছিল তাকে মিলের দু-আনার পার্টনার করে নেবে। সেই ধর্মভী মানুষটি যখন জানতে পারে অভিরামের জাতের ঠিক নেই, তখন ঈশ্বরকে তার সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করতে বলে, নচেৎ পার্টনারশিপের ব্যাপারটা তাকে ভেবে দেখতে হবে। সামান্য চাকরি থেকে ম্যানেজার,

তারপর দু-আনার পার্টনার, সারাজীবনের প্রতিষ্ঠা আজ ঈশ্বরের হাতের মুঠোয় । সুতরাং অভিরাম আর সীতার বিয়েতে সে মত দেয় না। সীতার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে একদিন সে নবজীবন কলোনিতে গড়ার লড়াই থেকে পালিয়ে এসেছিল। আজ নিজের কেরিয়োরের জন্য সীতার সুখশান্তি তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এইভাবে তার সুবিধাবাদী বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয়। সৎপাত্র দেখা সে ঘটা করে সীতার বিয়ের আয়োজন করে । বিয়ের রাতে সীতা অভিরামের সঙ্গে পালায়। বিয়ের টোপর, কনের সাজ ভেসে যায় সুবর্ণরেখার খাত ধরে।

আরও কয়েক বছর কেটে যায়। অভিরাম আর সীতা কলকাতার বস্তিতে থাকে। অইভরামের বই কেউ ছাপে না। সীতা ঠোঙা বানিয়ে সংসার টানে। এত ভাঙনের মধ্যেও সীতা আর সন্তান মিনুকে উজ্জ্বল এক পৃথিবীর গান শোনায়, 'আজ ধানের ক্ষেতে.....।' অভিরাম খেলা ছেড়ে বাস-ড্রাইভারের চাকরি নেয়। মিনুকে আশ্বাস দেয় নতুন বাড়িতে নিয়ে যাবে। কিন্তু একটা দুর্ঘটনার ফলে গণপিটুনিতে মারা যায়। সীতা মিনুকে নিয়ে আর্য্য অসহায় হয়ে যায়। অন্যদিকে ফাঁকা ঘর, শূন্য জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে যায়। সীতা ছিল তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এখন সে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যায়। রাতের অন্ধকেরে ঈশ্বর আত্মহত্যা করতে চায়। তখনই হরপ্রাসদের আবির্ভব হয়। বাতের অন্ধকারের ঈশ্বর আত্মহত্যা করতে চায়। তখনই হরপ্রসাদের আবির্ভাব হয়। রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ'র প্রথম লাইনটি সে চাবুকের মতো ছুঁড়ে মারে ঈশ্বরকে,' রাত কত হল? উত্তর মেলে না। ঈশ্বরের অধঃপতনের শেষ কোথায়, তার উত্তর সে নিজেই জানে না'। হরপ্রসাদের উত্তর দিয়েও বয়ে গেছে বহু ঝড়। আটটা স্কুল থকে সে চাকরিখুইয়েছে. তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে, সন্তানগুলি মারা গেছে। তারপর হরপ্রসাদ এই বোধে এসে দাঁড়িয়েছে ----প্রতিবাদই করো আর পালিয়েই যাও, কিছুতেই কিছু হবারন নয়। তাদের দুজনের আজ আত্মহত্যা করার ক্ষমতাটুকুপর্যন্ত নেই। সুতরাং শেষবারের মতো তারা একবার ভোগ করতে চায়। কলকাতায় এসে রেসের মাঠেষ বারে ঘন্টার পর ঘন্টা তারা কাটিয়ে দেয়। মহাভারতের নচিকেতাকে হরপ্রসাদের মনে হয় নহামূর্খ । সে সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে আত্মজ্ঞান লাভ করতে চেয়েছিল। ওসব অর্থহীন, ভোগই মুক্তির পথ। মাতাল অবস্থায় ঈশ্বর যার নারীসঙ্গ লাভ করতে এবং অহসায় সীতার ঘরে এসে ঢোকে। এটা আপাতদৃষ্টিতে একটা বিরাট কো-ইনসিডেন্স। এছবিতেএরকম অনেক কো- ইনসিডেন্সের ছড়াছড়ি। কিন্তু সেগুলো শুধু গল্পের বুনট তৈরির জন্য ব্যবহার হয়নি, হয়েছে বৃহত্তর অর্থে। ঈশ্বর সেদিন যেনারীকেই ভোগ করতে যেত সে কিন্তু তার বোনই হত। দাদার এই নগ্ন মুর্তি দেখে সীতাআত্মহত্যা করে এবং তার মৃত শরীরের উপর আবার কান্নার মতো ভেসে আসে গাঁদিজির সেই খেদোক্তি, 'হায় রাম'। যে-ভাঙনের ফলশ্রুতি ছিল ছবির উদবাস্তুরা, যে ভাঙনের ফলশ্রুতি ছিল গাঁধিজির মৃত্যু, তারই অন্তিম পরিণতি হয় ঈশ্বর এবং সীতার বিচ্ছেদে।

এরপর ঈশ্বরের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। কোর্টে বার বার নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বর ছাড়া পেয়ে যায়। হরপ্রসাদ মিনুকে এনে তুলে দেয় ঈশ্বরের হাতে। ঈশ্বরের অপরাধ স্বীকার করাটা হরপ্রসাদের কাচে মূর্খামি মনে হয় না, মনে হয় 'শিশুতীর্থ'র অনুরণন, 'মাতা দ্বারা খোলো'। ঈশ্বর মিনুকে নিয়ে ফিরে আসে ঘাটশিলায়। মিনুর কানে ভাসতে থাকে সীতার গলায় শোনো গানের সুর, 'আজ ধানের ক্ষেতে...।' সে ঈশ্বরের কাছে জানতে চায় সীতা -মা যে নতুন বাড়ির কথা বলেছিল সেখানেই তারা যাচ্ছে কি না। এছবিতে বারবারই সীতার মুখে নতুন বাড়ির কথা ঘুরে ফিরে এসছে। 'নাগরিক' ছবিতেও রামুর মুখে আমরা শুনেছিলাম নতুন বাড়ির স্বপ্ন। কিন্তুদেশভাগের বৃহত্তর পটভূমিকা সেখানে ছিল না। পূর্ববাংলা ছেড়ে চলে আসার সময় সেদিনের ছোট্ট সীতাকে প্রবোধ দেওয়া হয়েছিল তারা নতুন বাড়িতে যাচ্ছে। নবজীবন কলোনি ছেড়ে ঘাটশিলায় যাবার পথেও তাকে নতুন বাড়ির স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাকে সে-বাড়ি দেখাতে পারেনি, উপরন্তু সীতা তলিয়ে গেছে মৃত্যুর অতলে। তার জন্য দীয়ী ঈশ্বর। আজ ঈশ্বরের ঘাটশিলার চাকরিটা চলে গেছে, সেই কোয়ার্টার নেই, সমস্ত ভূলুণ্ঠিত, তবেঈশ্বর মিনুকে প্রবোধ দেয় তারা নতুন বাড়িতে যাচ্ছে। ঈশ্বরের মধ্যে স্বার্থপরতা, উচচাশা পালীয়নী মনোবৃত্তি ইত্যাদি মধ্যবিত্তসুলভ সব দোষই দেখা যায় । কিন্তু সীথার আত্মহত্যার পর তার যেন নবজন্ম হয়, আত্মোপলধিধঘটে। মিনুর সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। ভালো এবং মন্দ, সু এবং কু-র যে দ্বিজনীন দ্বন্দ্ব সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। ভালো এবং মন্দ, সু এবং কু-র মধ্যে যে

ঋিজনীন দ্বন্দ্ব আছে---- ঈশ্বর চরিত্রটিতারই আধার, তারই প্রতীক। শয়তান আসলে পথভ্রষ্ট দেবতা।

ত্রয়ী চিত্রের অপরিপূর্ণতা

'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা' ছবি তিনটিকে ঋত্বিক নিজেই ট্রিলজি বলে ঘোষণা করেন। 'বাংলা ভাগটাকে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারিনি। আজও পারি না। আর ওই তিনটে ছবিতে আমি ও -কথাইবলতে চেয়েছি। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও হয়ে গেল একটা ট্রিলজি।' ৩৫ কাহিনির দিক থেকে নয়, বিষয়ের দিক থেকে তনটি ছবিকে ট্রিলজি ধরা যায়। দেশভাগ এবং উদ্‌বাস্তু সমস্যা তিনটি ছবিতে পরোক্ষভাবে হোক বা প্রত্যক্ষভাবেই হোক, অত্যন্ত তীব্রভাবে উঠে এসেছিল। গভীরতরভাবে দেখতে গেলে ছবিগুলি এক অর্থে ভীষণভাবে অপরিপূর্ণ । যে-ছবি তিনি করতে চেয়েছিলেন, তা না করতে পারার অক্ষমতা থেকে এগুলোর জন্ম, এগুলো করার মধ্যেসেই অর্থে কোনও তৃপ্তি ছিল না।

'আচ্ছা, নিজের জমির উপর না দাঁড়িয়ে কিছু করা যায় কি ? কিছু সত্যিকারের গভীরকে ছোঁয়া সম্ভব ? আমি জানিনা, হয়তো শেষ বয়সে, বহু মোচড় খেয়ে, বহু মারের মধ্যে দিয়ে উত্তরণ হওয়া হয়তো সম্ভব আমার তো সে-স্তর আসেনি, সে-স্তরে পোঁছোনো কোনওদিন হয়ে উঠবে কি না সে বিষয়ে আমার ঘোরসন্দেহ আছে । কিন্তু সৃষ্টিকর্মের গোড়ার ধ াপে কাজ করতে আরম্ভকরার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের খোরার যারদেউলিয়া হয়ে গেছে, সে কী করবে?

আমি বলছি দেশভাগের কথা। আমি পুর্ববাংলার ছেলে। যে সামান্য কয়েকজনের আমার কাজ ভালো লাগে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন ঋত্বিক ঘটকের বর্তমানের বা অতি অল্পকালগত অতীতের সঙ্গে এবং বুঝি একটু ভবিষ্যতের সঙ্গে একটা কিছু গোছের যোগ মাঝে মাজে মনে হয় আছে, কিন্তু অতীত নেই, অতীতের ঐতিহ্য নেই। কথাটা বড়ো লাগে। অতীতবিহীন নিরালম্ব বায়ুভুত কাজ কাজই নয়। কিন্তু আমার অতিত আমাকে কে এনে দেবে ? আমার দিন কেটেছে পদ্ম ার ধারে ... একটা দুঁদে ছেলের দিন। গহনার নৌকার মানুষদের দেখছি অন্যগ্রহের বাসিন্দে । মহাজনি দুহাজার মনী ভ াড়া করে পাটনা, বাঁকিপুর, মুঙ্গের থেকে মাল্লারা পার হয়ে যেতে, এক ভাঙা দেহাতিআর পদ্মাপারি বাংলার টান-মাখ ানো কথা বলে। জেলেদের দেখেছি। ইলশেগুঁড়ির গ্রাম বর্ষার হঠাৎ বেজায় খুশি হয়ে যে-সুরে টান মারে, মনমাতানো হওয়াতে দমকায় দমকায় ভেসে আসতকেমন অস্পষ্ট মন কেমন করা পাগলসুরে, স্টিমারে শুয়ে রাত্রে দোলা খেয়েছি ম াতাল নদীর দাপটে, আর শুনেছি ইঞ্জিনের ধস্‌ধস্‌, সারেঙের ঘন্টা, খালসির বাঁও-না-মেলা আর্তনাদ। পদ্মায় শরতে নৌকা নিয়ে পালাতে গিয়ে একবার তিনমাথা সামন কাশবন হয়েছে কতলামারীর চরটার কাছে, ভারি সাপ থাকে ওখ ানে, ঢুকে পড়ে আর বেরোতে পারি না, নৌকা দুলিয়ে দুলিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে সেই ডাকাত কাশের কেশরের সাদা রেণু উড়ে উড়ে দেহমন আচ্ছন্ন করে নিশ্বাস প্রায় আটকে দিয়েছিল। সিন্ধুগৌরব-এ রাজা জাহিরের পার্ট করার জন্য হ ায়ার হয়ে গিয়ে ট্রেন ফেল করে সন্ধেবেলা পৌঁছেছি অজ পাড়াগাঁয়ে। সামনে হাওরবিল ডাকসাইটে ভূতের জায়গা, কোজাগরী পূর্ণিমার আগের রাত। সেই আবছা বিলে দুই বন্ধু মিলে লগি ঠেলছি। দিগন্তলীন বিলে মাঝে মাঝে জেগে অ াছে দ্বীপের মতো গ্রাম। নীহার পড়ছে, কাঁপছি। শেষে বোঝা গেল বিলের আত্মারা ধরেছে আমাদের। দু-ঘন্টার পথ স ারারাতেও কাবার করতে পারলাম না, দাঁধালেগে গেছে, আমরা গেছি বেপরোয়া হয়ে, শুয়ে পড়েছি সেই দিগন্তলীন বিলের বুকে। সকালে পৌঁছেছি।

মা, বাবা, দাদা, দিদি,, একান্নবর্তী পরিবার, হইচই করে বাইবোন মিলে খাওয়া। দুগ্‌গোপূজা, মুসলমান চাষিদের সেই বাঁ-পায়ের পেতলের মল পরে সারিগান। কত ডানপিটে বন্ধু। মারপিট, আম-লিচু-ডাব চুরি।পড়ে পা ভেঙে যাওয়া, ধার পড়ে মার খাওয়া। বাড়ির দেওয়ালে নোনা ধরে কত বিচিত্র দাগ। কত শব্ধ, ছবি কত মন। একটা সভ্যতা । মানুষের এক বিচিত্র প্রবাহ।

আর নেই। কিন্তু যদি থাকত !... দাঁড়াতে পারতাম তার উপরে। বলতে হয়তো পারতাম কিছু। এমনভাবে বর্তমানকে

বিকৃত মন নিয়ে দেখতাম না। ভবিষ্যৎকে এত ভয় করতাম না, দেশের এই মানুষের ভবিষ্যৎকে।
এগুলো প্রাণময়, এগুলো উদ্দাম। কিন্তু এই তো আমার আছে, আমি যদি লিখতে পারতাম, কবি হতাম, ছবি আঁকিয়ে হতাম, হয়তো এগুলো থেকে জরিয়ে নিয়ে বাড়তে পেতাম। কিন্তু আমি যে ছবি তুলি, আমার মতো কেউ হারালে না। যা দেখেছি তা দেখাতে পারছি না। কে চায় দুঃখ ? জীবন দুঃখ নয়, জীবন বীরত্ব।

এখানে কি নেই ? আছে। দু-দেশ দেখছি, খোঁজ করছি। কিন্তু আমি ছোটোবেলার রূপকথা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। সেটা হারিয়েছে। সেটা না থাকলে তো বাস্তব থেকে নতুন রূপকথা তৈরি করতে পারা আমার সাধ্য না। এখানে যুক্তি হবে। ট্রাজেডি হবে, কমেডি হবে। ... মানে যদি সামলাতে পারি। কিন্তু রূপকথা, সরল রূপকথা, যা দেখলে যুক্তি চুপ, বড়ো বড়ো থিয়োরি মাথা চুলকোতে আরম্ভকরে, ছোটো ছোটো ডানপিটের মন চাগার দিয়ে উঠে বসে, কোথায় ? অ ামার চৌহদ্দির মধ্যে তা নেই।

আমার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা এইটে। কাজ আরম্ভকরার আগেই-একটা সীমায় বদ্ধ হয়ে গেছি। কারণ, ও-ল্যান্ডস্কেপ এখ ানে পাব না। এ-মুখের আদল, ও-কথা বলার বিশেষ ঢংটি এখানে তৈরি করা যবে না।দুনিয়ার লোকের কাছে ওই বলে বানিয়ে দেখানো যায়, এখন কিছু হয়তো সাজিয়ে গুছিয়ে দাঁড় করানো যায়, কিন্তু ফিল্ম বড় সত্যবাদী। ওতে চিঁড়ে ভিজবে না। যার জন্য করা, সেই রূপকথাটাই হারাবে।

আমরা অযন্ত্রিক প্রসঙ্গে বলেছিলাম আর্কিটাইপের তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে ঋত্বিকের ছবিতে প্রকাশভঙ্গির গোলমাল এসেছে, দুর্বোধ্যতা এসেছে, কিন্তু তাঁর যুক্তি হচ্ছে---যেহেতু তাঁর পায়ের তলায় মাটি নেই, যেহেতু সিনেমা ভীষণভ াবেই ফটোগ্রাফিক ইমেজনির্ভর একটি মাধমে, সেহেতু যে-বাবনাচিন্তা এবং ইমেজগুলি ছোটোবেলা থেকে তাঁর মাথায় দানা বেঁধে আছে, সেগুলি তিনি ধরতে পারছে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মানদীর মাঝি কলকাতায় বসে লিখেছিলেন, যদিও সে-সময়ে দুই-বাংলা ভাগ হয়নি, কিন্তু লেখনিতে যেটা সম্ভব, দৃশ্যশ্রাব্যে সেটা সম্ভব নয়। চট্টগ্রামের ব্যাকড্রপ অ ান্দামানে কী অন্য কোথাও তৈরি করা য়ায না। অন্তত একজন সৎ ফিল্মকেকারের পক্ষে দুধের স্বাদ ঘোলেও মেটানো সম্ভব নয়। যদি পারতেন ঋত্বিক হয়তো সব কটি ছবিই বাংলাদেশে গিয়ে করতেন। কিন্তু সেই মুলুক, সেই বুলি, সেইসব লোকজন, আচার-ব্যবহার না পাওয়ায় তাঁর ছবি প্রকাশভঙ্গি অবদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর ছবির বিষয় এবং ভাষা আপসে উঠে আসেনি, জোরজার করে ঠুকেঠাকে বানাতে হয়েছে। সেই স্বয়ংপ্রকাশ ভাষা তাঁর কাছে অধরা থেকে গেছে। এবং ছবির মধ্যে নানাররকম অসংলগ্নতা এবং কষ্টকল্পনা এসেছে।

তিতাস একটি নদীর নাম ---উপন্যাসের বিকৃতি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর ঋত্বিকের কাছে ডাক এল সে -দেশে গিয়ে একটি ছবি করার। একটা সুযে াগ এল নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে রূপকথায় ফিরে যাওয়ার অদ্বৈত মল্লবর্মণ জাতিতে ছিলেন মালো এবং মালো জেলেদের জীবন নিয়ে রচিত একটি উপন্যাসের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান হয়ে রয়েছেন। ১৯৭০ সালে এসে ঋত্বিক সেই তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটি বেছে নিলেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া রূপকথার পুনর্নির্মাণের ভিত্তি হিসেবে। উপন্যাসটা আমার নিজের ধারণায় এপিক-ধর্মী, এ ছবিতে প্রথম এই ঢংটা ধরার চেষ্টা করেছি। ঋত্বিক পথমবার এই ঢংটা ধরার চেষ্টা করলেন, সেকথা অবশ্য ঠিক নয়। সুবর্ণরেখায় কেন এত কো-ইনসিডেন্স ব্যবহার সে-ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, গোড়া থেকেই কো-ইনসিডেন্স কোথায় কোথায় আসছে, সেটা দর্শককে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি,। ৩৮ অর্থাৎ এপিক বা রূপকথা তৈরির ইচ্ছেটা তাঁর মধ্যে বরাবরই ছিল,কিন্তু দেশভাগের ফলে সেটা তিনি পেয়ে উঠছিলেন না। একথা ঠিক, তিতাস একটি নদীর নাম ঋত্বিকের সবচেয়েলিনিয়ার, সবচেয়ে গল্প - বলা ফর্মের ছবি। এছবির মধ্যে সরল অথচ উত্তাল একটা ভঙ্গি আছে, কিন্তু শেষমেষ কিছবিটি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল, সেটাই এখন

আলোচ্য।

এই উপন্যাসের কাহিনি অনেকটা সময় জুড়ে, তিনটি প্রজন্ম ধরে ছড়িয়ে আছে। মালোদের জীবনের সমাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্ত রসদই ক্ষরিত হয় তিতাস থেকে। কিন্তু এই বিস্তৃত সময়ের প্রেক্ষাপটে তিতাস সত্যিই শুকিয়ে যায়। মালোরা হয়ে পড়ে অনাথ উৎপাটিত এক জাতি। ছবির শু হয় মাঘমণ্ডলের ব্রত দিয়ে। এদিন মালোপাড়ার কুমারী মেয়েরা তিতাসের জলে চৌয়ারি ভাসার আর যুবকরা তার দখল নেয়। যদিও সুবল আর কিশোর অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কিন্তু দীননাথ মালোর কিশোরী মেয়ে বাসন্তীর ভাসানো চৌয়ারি কিশোর পেলেই সে যেন খুশি হত। একটা ত্রিকোণ সম্পর্ক এবং নারীমনের অতৃপ্ত বাসনা দিয়ে ছবির শু হয়। সারা ছবি জুড়েই বাসন্তী যা চায় তা পায় না।

মালোদের রীতি অনুযায়ী সুবল আর কিশোর বৃদ্ধা তিলকচাঁদের সঙ্গে নৌকা নিয়ে বেরোয় ভাগ্যের সন্ধানে। মাছ ধরা আর বেচ া এই তাদের বাণিজ্য । দিনের পর দিন পেরোয়। এদিকে বাসন্তী কিশোরের পথ চেয়ে বসে থাকে।অন্যদিকে শুকদেবপুরের মোড়ল বাঁশিরামের আতিথেয়তা নেয় কিশোররা। দোলের দিন নাচগানের সময় পাশেরগাঁয়ের লে াকেরা আত্রমণ করে। গ্রাম্য রেষারেষির জের। কিশোর মোড়লের মেয়েকে জান দিয়ে বাঁচায়। পরিণামেবাঁশিরাম কিশে ারের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেয়। একদিন সে-গাঁয়ে কাটিয়ে পতে রাতের বেলা ডাকাতরা নৌকা থেকে টাকাপয়সা এবং সদ্যবিবাহিত বধূটিকে নিয়ে পালায়। কিশোর চিরজীবনের মতো পাগল হয়ে যায়। এরপর ছবিটা দশ বছর এগিয়ে যায়। এই ট্রানজিশনগুলো ছবিতে বড় আচমকা এসেছে। যার ফলে খেই ধরতে অসুবিধে হয়। যাই হোক, আমরা দেখি ব াসন্তী এখন পুর্ণযুবতি এবং বিধবা । সুবলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সুবল মালিকের প্ররোচনায় পাড়ের ধস থেকে নৌকা বাঁচাতে দিয়ে মারা যায়। বাসন্তী আনমনে চেয়ে থাকে তিতাসের দিকে । যদি তার সন্তানহীনা । মনটা জুড়ে ায়। সেই নদীপতেই একদিন কিশোরের বউ গাঁয়ে এসে হাজিরহয়, সঙ্গে বছর দশেকের ছেলে অনন্ত । সেদিন রাতে ড াকাতদের হাত ছেড়ে সে পালায়, অন্ধকারে সাঁতারে ওঠে তীরে। তারপর দুই বৃদ্ধ জাল্লার আশ্রয় পায়। তাদের সস্নেহ অ াশ্রয়ে অনন্ত জন্মায় এবং এতটা বড়ো হয়। এখন তার পিতৃপরিচয় চাই। স্বামীর মুখ তার আবছা মনে পড়ে, মাত্র একদিনের দেখা। নাম মনে নেই। শুদু গাঁয়ের নামটুকু মনে ছিল, গোকর্ণঘাট।

বেশ কিছু বিচার-বিবেচনার পর অনন্তর মা আর অনন্ত গাঁয়ে ঠাঁই পায় মূলত বাসন্তীর উদ্যোগে। অনন্তর মা মালোসম াজের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে থাকে, তাদেরই একজন হয়ে ওঠে। কিশোর তখন বদ্ধ উন্মাদ । বাসন্তী বুঝতে পারে অনন্তর মা আসলে কিশোরের সেই হারিয়ে যাওয়া বউ। অবার আসে দোলে। অননন্তর মা কিশোরের মুখে মা খিয়ে দেয় রং। কিশোর তার পাগলামি সত্ত্বেও চিনতে পারে বউকে । পাগলামি তার বেড়ে ওঠে। বুকে তুলে নেয় অনন্তর মাকে। সে বাধা দেয় না। কিন্তু এই অভব্য আচরণের জন্য নির্জন নদীতীরে গাঁয়ের লোকে তাদের পিটেয়ে মেরে ফেলে। তিতাসের পাড়ে দূজনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরে। মৃত্যুর আগে কিশোরের একটাই কাতরউক্তি বেরিয়ে আসে বউ...! ঘটনাচত্রে বৈধ সম্পর্কও সমাজের চোখে অবৈধ হয়ে যায়, এটাই ট্র্যাজেডি।

মায়ের মৃত্যুর পর অনন্তর দায়িত্ব নেয় বাসন্তী। যতই হোক অনন্ত তারই ইপ্সিত পুষের সন্তান। বাসন্তীর সন্তানহীনা মনটা জুড়োয় এবার। কিন্তু অনন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রতিবেশী উদয়তার সঙ্গে পালায়। বাসন্তীর বুক ভেঙে যায়। এর সঙ্গে শু হয় দুটো ঘটনা। একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তিতাস শুশোতে থাকে। আরেকটা ব্রাহ্মণ কায়েতদের ত্রমবর্ধমান অত্যাচার। এই দুটোর চাপে পড়ে মালোসমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ছবির শেষে জানা যায় অনন্তউদয়তারার কাছ ছেড়ে শহরে পা লিয়েছে। এদের কাছে তিতাসের মতো অনন্তও একটা নাম হয়ে যায়। যা একদিন ছিল, আজ নেই। মালেপাড়ার লে াকের ভিক্ষেবৃত্তি বেছে নেয়, কেউ মরে। তিতাসের বুকে এখন শুধু বালির চর। সেই চরের দখল নিয়ে জেলে এবং চাষ াদের মধ্যে রক্ত -ঝরা মারামারি চলে।

‘নদীমাতৃক সভ্যতা আমাদের পুববাংলা । তোমরা পুববাংলার কতটা দেখেছো আমি জানি না, কতটা গভীরে ঢুকেছো ত া ও জানি না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষভাবে গভীরে ঢুকেছি। তিতাস একটি নদী----যে -নদী হচ্ছে সাসটেনিং ফোর্স। সেই নদীটা শুকিয়ে যাচ্ছে ; তারপর কেদিন সে-নদী শুকিয়ে গেল। তখন নদীর মধ্যে যে- জমিটা জেগে উঠল তা আর জেলেদের থাকল না, তখন চাষিরা ফোরফ্রন্ট এসে গেল।...., সভ্যতার মৃত্যু নেই। সভ্যতা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের যেখানে তিতাসে থানের ক্ষেত জন্মেছে,সেখানে আর একটা সভ্যতার আরম্ভ।’

তিতাসের শুকনো চরে যখন জেলে এবং কৃষকদের মারামারি চলছে তখন বাসন্তী এসব দৈনন্দিন সংঘাতের ঊর্ধ্বে চলে যায়। তিতাসের বুক খুঁড়ে তৃষ্ণার পল খুঁজতে খুঁতে সে স্বপ্ন দেখে জলে জায়গায় চারিদিকে ধান। আর তার মধ্যে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে একটি শিশু দৌড়োচ্ছে। ঋত্বিক এরকম একটা রোমান্টিক ইঙ্গিতে ছবি শেষ করেছেন। সে তুলনায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনেক বাস্তববাদী।

‘রামপ্রসাদ মালো একলাই গিয়েছিল । তার বাড়ি -সোজা চরের মাটি দখল করিবার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও ঝাঁপ াইয়া পড়িল। জোয়ান ভাইদের পাশে রাখিয়া লড়াই করিতে করিতে বৃদ্ধ সেই মৃত্যুও বরণ করিল। করম আল, বন্দে আ লি প্রভৃতি ভুমিহীন চাষিরাও আসিয়াছিল, কিন্তু মার খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কেহ এক খামচা মাটিও পাইল না। তবে প াইল কে ? দেখা গেল, যারা অনেক জমির মালিক, যাদের জোর বেশি, তিতাসের বুক নয়া মাটির জমিনের মালিকও হইল তারই।’

উররি-কাঠামোয় একটা অঞ্চল নদীমাতৃক সভ্যতা থেকে কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় যতই পালটাক না কেন, তারও গভীরে থেকে যাবে আর্কিটাইপাল মাতৃত্ব---এই কথাটা দাঁড় করাতে গিয়ে ঋত্বিক রামপ্রসাদ মালো বা করম আলি ও বন্দে আ লিদের (পরের দুটি চরিত্র ছবিতে বাদই গেছে) সঙ্গে জমিদারদের উৎপাদন সম্পর্কের ব্যাপরটা এড়িয়ে গেলেন। বাস্তব সদ্য থেকে দূরে চলে গেলেন। কেন ? কারণ, জমিদাররা চাষের জমি দখল করছে আর ভবিষ্যতের সেই ধানিজমিতে ব াসন্তীর স্বপ্নের শিশু খেলা করে বেড়াচ্ছে ----এদুটো পরস্পর সংগতিবিহীন হয়ে যায়। অদ্বৈতমল্লবর্মণের তিক্ত বাস্তবতা আর ঋত্বিকের অলীক আশাবাদের মধ্যে আনপনের বৈপপীত্য, অ্যানটাগনিস্টিক কনট্রাডিকশন, আছে। একটাকে নস্যাৎ না করলে আরেকটা াসে না। আসলে ঋত্বিক শুধুমাত্র উপন্যাসের বাস্তবতা থেকে নয়, আজকের বাস্থবতা থেকেও মুখ ঘুরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কারণ, ওপার বাংলায় হাতে -কলমে ছবি করতে গিয়ে তিনি বুজেছিলেন পূর্ববাংলা সম্পর্কে এতদিন তিনি যা ভেবে এসেছিলেন, যা বলে এসেছিলেন, সবটাই ভুল, অলীক। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর ভয়ংকর মে াহভঙ্গ হয়।

বাংলাদেশ বলতে আমার যা ধারণা ছিল, ওই দুই বাংলা মিলিয়ে, সেটা যে তিরিশ বছরের পুরোনো সেটা আমি জানত াম না। আমার কৈশোর এবং প্রথম যৌবন পূর্ববাংলায় কেটেছে। সেই স্মৃতি, সেই নস্টালজিয়া আমাকে উন্মাদের মতো টেনে নিয়ে যায় তিতাসে, তিতাস নিয়ে ছবি করতে। তিতাস উপন্যাসের সেই পিরিয়ডটা হচ্ছে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর অ াগেকার, যা আমার চেনা, ভাষণভাবে নো। তিতাস উপনক্যাসের অন্য সব মহত্ত্ব ছেড়ে দিয়েও এই ব্যাপারটা আমাকে ভাষণভাবে টেনেছে। ফলে তিতাস একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি গোছের, সেই ফেলে-আসা জীবনস্মৃতির উদ্দেশে। ... আমার শৈশবরে সঙ্গে তিতাসের বহু ঘটনা জড়িয়ে আছে, অনেক কিছু আমি নিজের চোখে দেখেছি, ওই যে বললাম তিরিশ বছর মাঝখানে ব্ল্যাঙ্ক, আমি যেন সেই তিরিশ বছর আগেকার পূর্ববাংলায় ফিরে যাচ্ছি। একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা আম াকে, সত্যজিৎবাবুকে এবং আরও কয়েকজনকে স্টেট গেস্ট করে নিয়ে গিয়েছিল ঢাকায়। প্লেনে করে যাচ্ছিলাম, পাশে সত্যজিৎবাবু বসে, যখন পদ্মা ত্রস করছি তখন আমি হাই-হাউ করে কেঁদে ফেললাম। সে বাংলাদেশ আপনারা দেখেননি। সেই প্রাচুর্যময় জীবন, সেই সুন্দর জীবন...আমি যেন সেই জীবনের পথে চলে গেছি, সেই জীবনের মাঝখানে... এখনও যেন সব সেরকম আছে, ঘড়ির কাঁটা য়েন এর মাঝে আর চলেনি। এই বোকামি নিয়ে, এই শিশুসুলভ মন নিয়ে

তিতাস আরম্ভ।

ছবি করতে করতে বুঝলাম সেই অতীতের ছিটেফোঁটা আজ আর নেই, থাকতে পার না। ইতিহাস ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, ও হয় ন া, কিসসু নেই, সব সারিয়ে গেছে। এছবির স্ক্রিপ্ট লেখা থেকে শুটিং -এর অর্ধেক পর্যন্ত আমি মানুষের সংস্পর্শে প্রয় আ সিনি। ঢাকায় আমি থাকতাম না। এখান থেকে ঢাকা টাচ করে চলে যেতাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নইলে কুমিল্লা, নইলে আচা রিঘাট, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ, বৈদ্যবাজার এইসব, মানে গ্রামেগঞ্জে, ছবিটা তো গ্রাম-গঞ্জ-নদী নিয়েই, কাজেই সমস্ত সময়েই গ্রামে থেকেছি, ঢাকায় একদিন রেস্ট নিয়েই চলে গেছি, কা সঙ্গে দেখা করিনি, মিশিনি ; এদের রাজনীতি কী হচ্ছে না হচ্ছে তাকিয়ে দেখিনি, খবরের কাগজ পযন্ত সবসময়ে দেখে উঠিনি কাজেই ছবি করার ফার্স্ট পর্যন্ত এখনকার ব াংলাদেশের যা-চেহারা তার থেকে কমপ্লিটলি বিচ্ছিন্ন ছিলাম। আমি নিজেকে সমস্ত কিছু থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। ত ারপর ঢাকায় গিয়ে কয়েকদিন থাকতে হল, ছবির এটা-- ওটা-সেটার জন্য। তখন ক্রমশ দেখলাম সমস্ত জিনিসটা ফুরিয়ে গেছে, মানে একেবারেই গেছে, আর কোনও দিন ফিরবে না, একট খুবই দুঃখজনক আমার কাছে কিন্তু দুঃখ পেলে কী হবে, ছেলে মারা গেলে লোকে শোক করে, কিন্তু ইট ইস ইনএভিটেবল।' এই স্বীকারোক্তি ঋত্বিকের শিল্পীজীবনে একটা চরম আইরিনি বা পরিহাস হয়ে রইল। নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে ছবি না করতে পারার খেদ তিনি আজীবন প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বাংলাদেশে ছবি করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সেইজমিটাই আর নেই। কেন ভুল হল তাঁর ? যৌথ অবচেতন মন পূর্বনির্ধারিত, অনড়, মানুষ স্বভাবতই অপরিবর্তনশীল জীব----এই জায়গা থেকেই তাঁর মনে হয়েছিল, ছে াটোবেলায় যে - পুববাংলা তিনি দেখেছেন, আজও বাংলাদেশ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আর অল্পবয়সে তিনি যে-ব াংলাদেশ দেখেছিলেন, সেটা তাঁর পক্ষে হয়তো খুবই মধুর ছিল, কিন্তু আপামর মানুষের পক্ষে কি ততটা মধুর ছিল ? এ প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী সমালোচনা প্রণিধানযোগ্য, কারণ ঋত্বিকের সঙ্গে তাঁর ছোটোবেলাও কেটেছিল একই পরিবেশে।

'ঋত্বিকের মধ্যে শেষাবধি অশেষ রোমান্টিকতা এবং শিশুর মতো বাস্তবকে অবুঝ জেদে অস্বীকার করে চলার একটি ব্যাপ ার স্বাভাবেই ছিল। আর যা ছিল, ঋত্বিক-অনুরাগীরা রাগুন আর যা-ই মনে কন, আর চিতল সেই ইতিহাসচেতনার অভ াব য প্রেক্ষিত প্রাপ্তি এনে দেয়। ইতিহাসচেতনা থাকলে, যিনি এত বিষয়ে এত জানতেন, তিনি বুঝতেন, তাঁর শৈশব-বাল্য - কৈশোর খুবই শেল্টার্ড্ ছিল বলে, দেশের গ্রাম - মাঠ-নদী মানুষ তাঁকে প্রাণরস যোগাত বলে দেশ মানুষ জীবন কিছু সুখে ছিল না। দেশের যে-চেহারা স্বাধীনতার পর দেখা গেল, ইতিহাসচেতনার ফলে যে বিশ্লেষণী পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান জন্ম ায় তা ঋত্বিকের থাকলে তিনি বুঝতেন, এই নৈরাজ্য, নগ্নতা, ছিন্নমূলতা হঠাৎ স্বাধঈনতার পরই গজিয়ে ওঠেনি। দেশের ইতিহাস যে পথে চলছিল তাতে ঠিক ঠিক ইতিহাসম্মত পরিণতিই ঘটেছে এবং আমরা আতিগতভাবে এরচেয়ে ভালো অবস্থা হওয়ার মতো কোনও কাজ কোনও ফ্রন্টেই করিনি।'

ইউঙীয় মনোদর্শন দিয়ে এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে না পারায় ফলে তাঁকে পালিয়ে যেতে হল শৈশবে, নাস্টলজিয়ায়। ধরে নিতে হল ঘড়ির কাঁটা গেছে থেমে, আজকের বাংলাদেসের বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হল ঘড়ির কাঁটা গেছে থেমে, আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হল, এই পশ্চদ্গমনের তীব্রতা এমন ছিল যে, খবরের মাগজও তিনি দেখতেন না। ফলত একধরণের সুবর্ণ অতীতচায়িতার তিনি আটকে গেলেন।

যুক্তি, তক্কো ও গপ্পো---আর গপ্পো নয়, যুক্তি এবং তক্কো

'ছবির নাম হচ্ছে যুক্তি, তক্কো ও গপ্পো, আর্গুমেন্টস অ্যান্ড আ স্টোরি। তোমাদের গপ্প না হলে ভালো লাগে না, তাই একটা গপ্পো দিচ্ছি, আসলে একটা যুক্তিতর্ক, ইট ইজ কমপ্লিটলি অ পলিটিকাল ফিল্ম।' আজীবন ঋত্বিক একটা স্বতোচচা রিত এপিক বাচনভঙ্গির কথা বলে এসেছিলেন। এই প্রথম তাঁকে সে-জায়গা থেকে সরে আসতে দেখা গেল। কারণ ব

াংলাদেশের ধাক্কা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল আজকের যুগে রূপকথা তৈরি অসম্ভব। ফলে গপ্পোর জায়গায় যুক্তি এবং তক্কোর চাপান-উতোর এছবিতে তাঁর মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। ঋত্বিক -নির্মাত াটটি ছবির মধ্যে যুক্তি, তক্কো ও গপ্পোতে (১৯৭৪) গল্পরেখা সবচেয়ে ক্ষীণ, এটি তাঁর সবচেয়ে নন-লিনিয়ার, স্ট্যাকাটো, ভাঙা ভাঙা ফর্মের ছবি।

ছবির শুতে দেখা যায় এক বৃদ্ধ ঝুপড়ির মধ্যে বসে আছে, আর একটা সাজেস্টিক সেটে ক্ষ পরিসরে তিনটি কালো মুখে াশপরা প্রতিমুর্তি নাচানাচি করছে। নাচের ভঙ্গিটা তাণ্ডব থেকে লাস্যে পরিণত হয়। তারা দর্শকের দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ করে--- এই অবস্থার জন্য সবাই দায়ী। ছবির মাঝে একবার এবং শেষেও এই নাচটি ফিরে আসে ।এবং দেখা যায় সে বৃদ্ধ তখনও চুপচাপ বসে আছে। সে আসলে এই ভারতবর্ষ বা তার সংখ্যাগরিষ্ঠজনগণ। তারা অপেক্ষা করছে আর সারা দেশ জুড়ে ভূতের নৃত্য চলছে। দুটি নাচের মধ্যে পুরো ছবিটা বাঁধা থাকার দন এরকম একটা স্বগতোক্তি ঋত্বিকের তরফ থেকে বেরিয়ে আসে যে, আর পাঁচটা বাগাড়ম্বরের মতো এছবিটিও একটি।স্রষ্টার তরফ থেকে অনেক কিছুই বলা হল, কিন্তু আপামর ভারবর্ষের তাতে কিছু এল গেল কি ?

প্রথম নাচের দৃশ্যর পরই ছবিতে ঘনিয়ে ওঠে দুর্যোগ। নীলকণ্ঠকে ছেড়ে দিয়ে তার স্ত্রী দুর্গা চলে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় ত ার সন্তান সত্যকে। সাউন্ড- ট্র্যাকে তখন বিথোভেনের পঞ্চম সিম্ফনির ঝড়। ফেইট নাকিং অ্যাট দ্য ডোর,নিয়তির করাঘ াত। পাদপ্রদীপের আলো থেকে চিরকালের দুর্গা সরে যাওয়ার পরই একালের বঙ্গবালার আবির্ভাব।আশ্রয়ের সন্ধানে একটি নীড়হারা পাখি, যায় নাম বাংলাদেশ। দুর্গার সঙ্গে বিচ্ছেদে নীলকণ্ঠর যত বিরহ, তা বঙ্গবালাকে ঘিরে । কারণ ওট া আসল হলেও এটা তার বাচচা সংস্করণ। একাত্তরের যুদ্ধ বঙ্গবালা উদ্বাস্তু। ত্রস্ততার চাহনিএবং তার দরকার একটা অ াশ্রয়ের নীলকণ্ঠর আরেকটি সাগরেদ নচিকেতা। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেকার।এই দুজনকে নিয়ে নীলকণ্ঠ বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। এরপরই ছবিটি হয়ে যায় একটা জার্নির মতো। পথে জুটে যায়একসংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, জগাই। পার্কের খোলা বেঞ্চি, রাস্তার মদখোর পকেটমার, বাতেলাবাজ শ্রমিকনেতা, গ্রাম্য ছৌ-শিল্পী এবং উগ্র সন্ত্রাসবাদীদের ডেরা পর্যন্ত অ াজকের বাংলারল জন্য, বঙ্গবালার জন্য একটা আশ্রয়ের সন্ধান চলতে থাকে। এবং এই অভিযানের মধ্যে দিয়ে সে-সময়ের সমাজের বিভিন্ন অংশের একটা ত্রাস সেকশন ধরা পড়ে।

কলকাতার এক পার্কে রাত কাটানোর সময় নীলকণ্ঠ একপাশে বঙ্গবালা আরেক পাশে নচিকেতাকে নিয়ে তাঁর প্রেমে পড় ার গপ্পো শোনাতে বসেন। রাতের অন্ধকার কেটে যায়। আমরা দেখি কিছু ভাঙা ভাঙা উজ্জ্বল দৃশ্য। আদি অন্তহীন আক াশ, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, পেঁজা পেঁজা মেঘ, বনের মাথায় রোদ্দুর, ঝরনার তরঙ্গভঙ্গ---কিন্তু সবই ক্ষণস্থায়ী, কিছুই দানা বঁ াধছে না, চকিতে এসে চকিতে উঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে. এর মধ্যে নীলকণ্ঠ এলেন শিশুসুলভ উচছলতায়, পরনে ধোপদুরস্থ পোশাক, মুখে অনাবিল হাসি, সঙ্গে দুর্গা। তিনি তাঁর আর্কিটাইপাল চেতনা-প্রতিমার মুখে মুখ রাখলেন, আকাশে বাত াসে খেলে বেড়াচ্ছে তখন বেহাগের অতৃপ্ত সুর---

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।।
পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পূরে,
কী মাধুরীসুগন্ধবাতাসে যায় ভাসি।।

বাংলা ছবিতে এত বলিষ্ঠ প্রেমের দৃশ্য আমরা আগে দেখিনি। কিন্তু হঠাৎ কেটে গেল তাল, ঘুটে গেল নেশা, তাল-ফেরতার মুখে ছন্দপতন ঘটে গেল, পুলিশের ভ্যানের ব্লেক কষার তীব্র শেলের মতো শব্দে দৃশ্যটি ছিন্নভিন্ন হয়েগেল। অ ামরা ফিরে এলাম সত্তর দশকের কলকাতার নোংরা একটা রাতে, সেই পার্কে। সেটা চিল উত্তাল কেটা সময়। সন্দেহপ্রবণ পুলিশ অফিসার জেরা করতে শু করে----কে তারা, এত রাতে পার্কে বসে কী করছে, এইসব।

ঋত্বিকের শিল্পীজীবনের ট্রাজেডিটা তিনি এই দৃশ্যে বলতে চেয়েছেন। যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত শোনেন, তরা জানেন এই গানটিতে স্পষ্টত দুটো অংশ ছিল। প্রথম অংশটিকে বলা যেতে পারে একটি সংবেদনশীল, শিল্পীমনের চারপাশ থেকে আহরণের পর্যায়, যেটা ঋত্বিক ছবিতে ব্যবহার করেছেন। ছোটোবেলা থেকেই এই দেশ তার জল, মাটি, বাতাস, তার সমগ্র আদিমতা নিয়ে ঋত্বিকের কাছে ধরা দিয়েছিল, ছবিতে যা দুর্গার সঙ্গে মিশে গিয়ে চপলা এক প্রেমিকার রূপ ধরে। গানটির দ্বিতীয় অংশটিকে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের পর্যায় বলে চলে।

সহসা মনে জাগে আশা,
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নিয় ভাষা।
আজ মম রূপে বেশ লিলি লিখি কার উদ্দেশে---
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধিন নাশি।।

এই অংশটা ঋত্বিক ব্যবহার করেননি, পুলিশভ্যানের শব্দে দৃশ্যটি হঠাৎ শেষ করেছেন। কারণ, প্রথমত তার ছোটবেলার পুববাংলায় গিয়ে তিনি ছবি করতে পারেননি, দ্বিতীয়ত তাঁর দেখা বাংলাদেশ আমূল পালটে গেছে। তাঁর মর্মের বাণী বন্দিনীই থেকে গেছেন, সেই অগ্নিভাষা, আর্কিটাইপাল ল্যাংগুয়েজ, তাঁর অধরা থেকে গেছে।

এরপর ঘুরতে ঘুরতে গ্রাম্য শিল্পীর ডোরায় বঙ্গবালা নিজেকে বেশ স্বচ্ছন্দ মনে বেশ স্বচ্ছন্দ মনে করে এবং সেই ছৌ - শিল্পীও বঙ্গবালাকে মা-জ্ঞানে নিজের করে নেয়। এই ছবির সবটা জুড়েই বঙ্গবালা থাকে। শুধু সাঁওতাল আদিবাসীদের ঢেরায় ঋত্বিক বঙ্গবালকে বাদ দিয়ে নীলকণ্ঠকে একাই হাজির করেন। সাঁওতালদের ঝিাসের সঙ্গে বঙ্গবালারূপী মাদার আর্কিটাইপকে ঋত্বিক আর মিলিয়ে উঠতে পারেন না। সাঁওতাল নাচ এবং তাদের সঙ্গে নীলকণ্ঠর মদ্যপানের দৃশ্য এছবিতে পুরোপুরি বাড়তি এবং প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

শেষমেশ নীলকণ্ঠ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের এক ডেরায় এসে ওঠে। ভারবর্ষের ইতিহাস এবং মার্ক্স এঙ্গেলস থেকে গুয়েভারা, কাস্ট্রো পর্যন্ত কমিউনিজমের ইতিহাস নিয়ে যখন সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্ক চলতে থাককে তখন বঙ্গবালার সঙ্গে নচিকেতার, যে প্রথম থেকেই বঙ্গবালাকে ভুল বুজে এসেছে, মধ্যে মিলনের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়, সাউন্ড-ট্র্যাকে আমরা শুনি তাদের রমণের শব্দ । একান্তরে বসে তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল নকশাল আন্দোলনের পথ ধরে কোনও সূত্র বেরিয়ে আসতে পারে। যদিও তিনি বলেন, কমিউনিজমের নামে দেশে দেশে য়ে- অ্যাডভেঞ্চারিজম, নাইলিজম, টেররিজম চলছে. ত তাঁর বোধগম্য নয়। অতিবাম বিচ্যুতি যে ডানদিকে হাত শক্ত করে, একথা এলিড়য়ে গিয়ে এরা যে অগ্নিযুগের ছেলেদের মতো এই সঙ্গে সফল এবং বিফল, এই আস্থা তিনি তাদের উপর রেখেছেন। আবার বলেছেন, আজকে কোন সিদ্ধান্ত ইউনিয়ান কনডিশনকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে সেটা আমার জানা নেই। আমি কনফিউসড, ফুললি কনফিউসড্ড। এরপর নীলকণ্ঠর আর বেঁচে থাকার কোনও আধিকার থাকে না। প্রতিত্রিয়ার পুলিশি এ্যামবুশে উগ্রপন্থাদের সঙ্গে নীলকণ্ঠও মারা যান। সাউন্ড- ট্র্যাকে আবার পঞ্চাম সিম্ফনি বেজে ওঠে। নিয়তির পরিহাস। আগেরবার দুর্গা তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল। এবার বিদায় পৃথিবী থেকে। এই ছবির বছর দুয়েকের মধ্যে ব্যক্তি ঋত্বিকও দেহ রাখলেন ---৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ সালে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com